Contents

তাওহীদের ডাক

মে-জুন ২০১৪

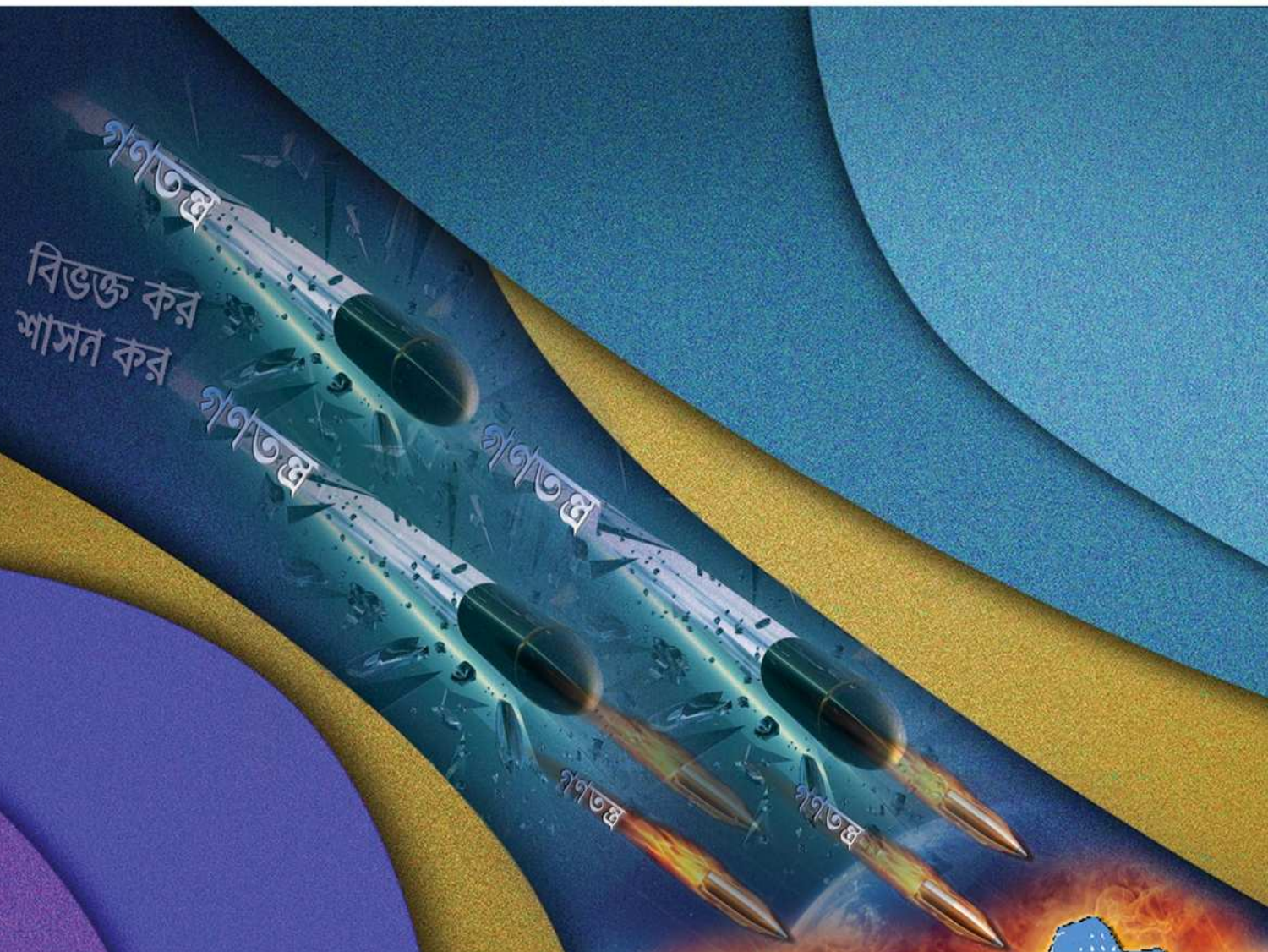

গণতন্ত্রের কদাকার অভিলাষ : ইসলামী নেতৃত্বের স্বরূপ

Contents

তাওহীদের ডাক

১৮তম সংখ্যা
মে-জুন ২০১৪

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
সহকারী সম্পাদক
বযলুর রহমান

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
- **আক্বীদা** ৫
  ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৫
  মুযাফফর বিন মুহসিন
- **তাবলীগ** ৯
  ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান
  আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস
- **তারবিয়াত** ১১
  পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার
  বযলুর রহমান
- **তাজদীদে মিল্লাত** ১৫
  শিরক ও তার ভয়াবহ পরিণতি : পর্ব-২
  ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
- **ধর্ম ও সমাজ** ১৭
  অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে ছিয়ামের ভূমিকা
  অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন
- **চিন্তাধারা** ২২
  শরী'আতের নামে মন্দ চর্চা : প্রসঙ্গ শবেবরাত
  মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ আলম
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** ২৭
  গণতন্ত্রের কদাকার অভিলাশ : ইসলামী নেতৃত্বের স্বরূপ
  আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ৩২
  দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
  ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে** ৩৪
  আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ
- **পরশ পাথর** ৪০
  ইসলামের ছায়াতলে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ যুভান শংকর রাজা
  অনুবাদ ও সংকলন : কে. এম রেযওয়ানুল ইসলাম
- **ভ্রমণস্মৃতি** ৪১
  সিঙ্কুতীরের করাচীতে
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৪৫
  পদ্মায় নৌকা ভ্রমণ : দুঃসহ একটি দিন
  আকরাম হোসাইন
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** ৫০
- **সংগঠন সংবাদ** ৫১
- **সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)** ৫৫
- **আইকিউ** ৫৬

সম্পাদকীয়

মাহে রামাযান : মুছে যাক যাবতীয় গস্নানি

নবী-রাসূলগণ ছাড়া কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। এ জন্য মানুষ দুনিয়াবী পরীক্ষার জীবনে শিরক-বিদ'আত, মিথ্যাচার, প্রতারণা, ছলনা, চোগলখোরী, গীবত, তোহমত, দুর্নীতি, আত্মসাৎ, সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, হত্যা, খুন, গুম, গর্ব-অহংকার, যেনা-ব্যভিচার, যুলুম-অত্যাচার, লোভ-লালসা, স্বেচ্ছাচারিতা, দাম্ভিকতা, মুনাফেকী, চাটুকারিতা, পদলেহন, পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা, চৌর্যবৃত্তি, ভন্ডামি, অন্যের পিছনে লাগা, অন্যের ইযযত হরণ করা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি নোংরা কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে। তাই যারা নিজেদেরকে পাপমুক্ত ফেরেশতাতুল্য মনে করে বা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিষ্পাপ ভাবে এবং ব্যক্তিগত দম্ভে আল্লাহ্র নিকট বিনীত হয় না, তারা ইবলীস শয়তানের বিশেষ প্রতিনিধি। কারণ এগুলো ইবলীসী স্বভাব।

মানুষ যেন পাপমুক্ত হয়, পাপ করে যেন ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারে সে জন্য আল্লাহ অনেকগুলো মাধ্যম উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম মাধ্যম ছিয়াম। মূলতঃ ছিয়াম ও নফল ছাদাক্বা পাপ মোচনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। বড় বড় অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রায় স্থানে ছিয়াম ও ছাদাক্বার কথা বলেছেন *(বাক্বারাহ ১৯৬; নিসা ৯২; মায়েদাহ ৮৯; মুজাদালাহ ৪)*। বিশেষ করে রামাযান মাস ক্ষমা পাওয়ারই মাস। বান্দা যেন তাক্বওয়া অর্জন করে পাপমুক্ত হতে পারে এবং আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে সে জন্যই এই রামাযান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাক্বওয়াশীল হতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, নেকীর উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করবে, তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি রামাযান মাসে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করবে তার পূর্বের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রিতে ইবাদত করবে তার পূর্বের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে *(বুখারী হা/২০০৯ ও ২০১৪)*। ছিয়ামের মূল লক্ষ্য মানুষকে পাপমুক্ত করা এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেয়া। রাসূল (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, আল্লাহ আহ্বান করে বলেন, হে কল্যাণের অভিসারী! এগিয়ে যাও। হে অকল্যাণের অভিযাত্রী! তোমার গতি রোধ কর। রামাযানের প্রত্যেক রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দিন ইফতারের সময় অসংখ্য মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২-৪৩)*।

নফল ছিয়াম সম্পর্কেও একই ধরনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আশুরার ছিয়াম সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করছি যে, আশুরার ছিয়ামের বিনিময়ে আল্লাহ পূর্বের এক বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। অনুরূপ আরাফার ছিয়াম সম্পর্কে বলেন, আমি আল্লাহ্র কাছে আশা করছি যে, এই একটি ছিয়ামের বিনিময়ে বিগত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন *(মুসলিম হা/২৮০৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে আর জাহান্নামের মাঝে এত বড় একটি গর্ত তৈরি করবেন, যা আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্বের সমান *(তিরমিযী হা/১৬২৪, মিশকাত হা/২০৬৪)*। ছিয়াম জাহান্নামের ঢাল *(তিরমিযী/৭৬৪)*। অন্যত্র বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে ৪০ বছর পথের দূরত্বে রাখবেন *(বুখারী হা/২৮৪০; মিশকাত হা/২০৫৩)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল অথচ পাপ ক্ষমা করে নিতে পারল না সে অভিশপ্ত বা তার নাক ধূলায় ধূসরিত হোক *(তিরমিযী হা/৩৫৪৫)*। ছিয়াম ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্র কাছে ছায়েমের জন্য সুপারিশ করবে এবং আল্লাহ তার সুপারিশ কবুল করবেন *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৮৩৯)*।

অতএব আসুন! আমরা আল্লাহভীতি অর্জন করি। আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বন করি। যাবতীয় গস্নানি ঝেড়ে ফেলি। মাহে রামাযানের বরকতে পাপমুক্ত হই। আল্লাহ্র কাছে অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করি। জগৎ সমূহের প্রতিপালক, রাজাধিরাজ, সকল বিচারকের বিচারক আহকামুল হাকেমীন একজন আছেন বলে দৃঢ় বিশ্বাস করি। তিনিই প্রকৃত বিচারক। সামান্য কোন পাপ, কোন ছলনা, কোন অপরাধ, আত্মগরিমা আল্লাহ্র সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তিনি অন্তরের খবর রাখেন। কে কোন্ উদ্দেশ্যে কী করছে সবই তিনি জানেন। ক্বিয়ামতের মাঠে এর যথাযথ হিসাব নেয়া হবে। সেখানে পালানোর কোন সুযোগ থাকবে না।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনে যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা করুন! আমাদের ত্রম্নটিগুলো মার্জনা করুন! হক্ব বুঝার ও হক্ব পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন! আমাদের আমলগুলো কবুল করুন এবং তার মাধ্যমে যাবতীয় কল্যাণ ও বরকতের পথ উন্মুক্ত করুন! আপনার দয়া ও রহমতের ছায়ায় আমাদের আচ্ছন্ন করুন-আমীন!!

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

আল-কুরআনুল কারীম :

১- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

'বলুন! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

২- اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

'শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২/২৬৮)*।

৩- وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا.

'কেউ কোন মন্দ কাজ করার পর অথবা নিজের উপর যুলুম করার পর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু হিসাবে পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*।

৪- وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

'আর আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচন করার কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(ইউনুস ১০/১০৭)*।

৫- وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ.

'সে বলল, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ প্রবণ; কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক তো অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(ইউসুফ ১২/৫৩)*।

৬- وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.

'মঙ্গলের পূর্বে ওরা আপনাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও ওদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও আপনার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং আপনার প্রতিপালকের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর' *(রা'দ ১৩/৬)*।

৭- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

'আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা যবেহকালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নাম নেওয়া হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন; কিন্তু কেউ অবাধ্য কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে বাধ্য হলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(নাহল ১৬/১১৫)*।

৮- أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ- قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

'এরা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক্ব প্রশস্ত করেন অথবা যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য'। 'বলুন! হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ–তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(যুমার ৩৯/৫২-৫৩)*।

৯- وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

'আপনি বের হয়ে ওদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি ওরা ধৈর্যধারণ করত, তাহলে তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(হুজুরাত ৪৯/৫)*।

১০- وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যার ব্যাপ্তি আসমান ও যমীনের ন্যায়। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য'। 'যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩-১৩৪)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কেউ বিছানায় শুতে গেলে সে যেন তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তা তিনবার ঝেড়ে নেয়। আর বলে, হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমারই নামে আমার শরীরের পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে আবার তা উঠাব। তুমি যদি আমার জীবন আটক রাখ, তাহলে ক্ষমা করে দিবে। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তাহলে তোমার নেককার বান্দাদেরকে যেভাবে হেফাযত কর, সেভাবে হেফাযত করবে *(বুখারী হা/৭৩৯৩)*।

১২- عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللَّهِ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلاَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِى يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ.

জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এক লোক বলল, আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ অমুক লোককে মাফ করবেন না।

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে লোক কে? যে শপথ করে বলে যে, আমি অমুককে মাফ করব না? আমি তাকে মাফ করে দিলাম এবং তোমার শপথকে নষ্ট করে দিলাম *(মুসলিম হা/৬৮৪৭)*।

١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِى وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীদের যখন কোন কাজের নির্দেশ দিতেন, তখন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দেশ দিতেন। একবার তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তা শুনে তিনি রাগ করলেন; এমনকি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্ন ফুটে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের চেয়ে আমিই আল্লাহকে অধিক ভয় করি ও বেশী জানি *(বুখারী হা/২০)*।

١٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি যেন এখনো নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখছি, যখন তিনি একজন নবীর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তাঁর স্বজাতিরা তাঁকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তাঁর চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও; কেননা তারা জানে না *(বুখারী হা/৩৪৭৭)*।

١٥- عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا لَهُمْ.

আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যদি তোমাদের কোন পাপ না থাকত, যা আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, তবে অবশ্যই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় বানাতেন যাদের পাপ হত এবং তিনি তা ক্ষমা করে দিতেন *(মুসলিম হা/৭১৪০)*।

١٦- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَلَسَ فِى مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِى مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে লোক মজলিসে বসে প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথা-বার্তা বলেছে, সে উক্ত মজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি', তাহলে উক্ত মজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিল তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে *(তিরমিযী হা/৩৪৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৬১৯২, সনদ ছহীহ)*।

(١٧) عَنْ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُنِيهِ عَنْ جَدِّى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ.

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম যায়েদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার আবক্ষাকে আমার দাদার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে 'আসতাগফিরুল্লাহ হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলায়হ', তাহলে সে যদি জিহাদের ময়দান হতেও পলায়ন করে; তবুও তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে *(আবুদাঊদ হা/১৫১৭; মিশকাত হা/২৩৫৩, সনদ ছহীহ)*।

(١٨) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা যদি পাপ না করতে তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে এমন সম্প্রদায় বানাতেন, যারা পাপ করে ক্ষমা চাইত এবং তিনি তাদের মাফ করে দিতেন *(মুসলিম হা/৭১৪১; মিশকাত হা/২৩২৮)*।

(١٩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকট আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আমার নিকট দো'আ করবে? আমি তার দো'আ কবুল করব। কে আমার নিকট কিছু চাইবে? আমি তাকে তা দান করব। কে আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাইবে? আমি তার গুনাহ ক্ষমা করে দিব *(বুখারী হা/৬৩২১; মুসলিম হা/১৮০৮)*।

(٢٠) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে সত্তরবারেরও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করে থাকি *(বুখারী হা/৬৩০৭; মিশকাত হা/২৩২৩)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমাদের নিকট দু'টি আমানাত ছিল। প্রথমটি বিদায় নিয়েছে, সেটি হল আমাদের মাঝে রাসূল (ছাঃ) ছিলেন। আর দ্বিতীয়টি হল ক্ষমা প্রার্থনা করা; যা অবশিষ্ট রয়েছে। এটিও যখন চলে যাবে তখন আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

সারবস্তু

১. আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও তার সন্তান-সন্ততিরা আল্লাহ্‌র নে'মত ও রিযিক লাভ করে থাকে।
২. ক্ষমা প্রার্থনাকারী মানুষ হোক বা জীন হোক তার নিকট থেকে শয়তান দূরে থাকে ।
৩. ক্ষমা প্রার্থনাকারী ঈমান ও আনুগত্যের প্রকৃত স্বাদ পেয়ে থাকে।
৪. আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রকৃষ্ট মাধ্যম হল ক্ষমা প্রার্থনা।
৫. বুদ্ধি ও ক্ষমা প্রার্থনার উপায় হল আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।

ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৫

-মুযাফফর বিন মুহসিন

(১৯) চার মাযহাব মানা ফরয। কেউ বলেন, কোন একটির অনুসরণ করা ফরয।

পর্যালোচনা :

এই প্রচারণা ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাসের শামিল। কারণ এই ফরয হওয়ার ঘোষণা কে দিল? চার মাযহাবের জন্ম হল কখন? হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী নামে চার মাযহাব প্রতিষ্ঠা করা এবং তা প্রচার করার অনুমতি কে দিল? এটা মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।

সুধী পাঠক! নিঃসন্দেহে উক্ত চার ইমামের জন্মের পূর্বে মাযহাব সৃষ্টি হয়নি। তাহলে তাদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখটা আমরা জেনে নিই। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর জন্ম ৮০ হিজরীতে আর মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। ইমাম মালেক (রহঃ) ৯৩ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) জন্ম গ্রহণ করেন ১৫০ হিজরীতে আর মৃত্যু বরণ করেন ২০৪ হিজরীতে। এছাড়া ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) জন্ম গ্রহণ করেন ১৬৪ হিজরীতে আর মারা যান ২৪১ হিজরীতে। তাহলে ৮০ হিজরীর পূর্বে এই মাযহাবী ফেৎনার সূত্রই ছিল না।

এখন দেখার প্রয়োজন তাঁদের নামে মাযহাবের সূচনা হল কখন? হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৪১ হিঃ) প্রচলিত মাযহাব সমূহের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন, إِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِى الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُوْمِ 'মূলতঃ এই বিদ'আতের (তাক্বলীদী মাযহাবের) উৎপত্তি হয়েছে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর নিন্দিত যুগে'।[১] শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) বলেন,

إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَّاحِدٍ بِعَيْنِهِ.

'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলিম ব্যক্তি নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'।[২]

উক্ত আলোচনায় বুঝা যাচ্ছে মাযহাব ফরয হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ কোন বিধান ফরয করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর তা হবে নবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ৭০ বছর পরে যদি ইমামদের জন্ম হয়, তবে মাযহাব ফরয হওয়ার বিষয়টি কি নিরেট মূর্খতা নয়?

দ্বিতীয়তঃ বিদ্বানগণের বক্তব্য অনুযায়ী বুঝা যাচ্ছে, ৪০০ হিজরীতে মাযহাবের সূচনা হয়েছে। তাহলে ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর ২৫০ বছর পর তার নামে মাযহাবের সূচনা হয়েছে। আর সর্বকনিষ্ঠ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মৃত্যুর প্রায় ১৫৯ বছর পর তার নামে মাযহাবের সূচনা হয়েছে। তাহলে তারা মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই দাবীটা কোন্ ধরনের অজ্ঞতা তা কি পরিমাপ করা যাবে? অতএব চার মাযহাব বা কোন একটি মাযহাবের অনুসরণ করা ফরয এ কথা উদ্ভট ও বানোয়াট।

অন্যদিকে তারা কি তাদের মাযহাব বা ফাতাওয়ার অনুসরণ করতে বলেছেন? না কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। আসুন তাদের বক্তব্যগুলো বিশ্লেষণ করি-

(ক) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) বলেন,

لَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ.

'ঐ ব্যক্তির পক্ষে আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল নয়, যা সম্পর্কে সে জানে না আমরা তা কোথায় থেকে গ্রহণ করেছি'।[৩]

(খ) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِىْ رَأْيِىْ فَإِنْ وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَمَا لَمْ يُوَافِقْهُمَا فَاتْرُكُوْهُ.

'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুলও করি, সঠিকও করি। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো তোমরা যাচাই কর। যেগুলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে মিলে যাবে সেগুলো গ্রহণ কর, আর যেগুলো মিলবে না সেগুলো বর্জন কর'।[৪]

(গ) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتَ كَلَامِىْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلَامِىْ الْحَائِطَ.

'যখন তুমি আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে'।[৫]

(ঘ) ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন,

لَاتُقَلِّدْنِىْ وَلَا تُقَلِّدَنَّ مَالِكًا وَالْأَوْزَعِىَّ وَلَا النَّخْعِىَّ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

'তুমি আমার তাক্বলীদ কর না, মালেক, আওযাঈ, নাখঈ বা অন্য কারো তাক্বলীদ কর না। বরং সমাধান গ্রহণ কর কিতাব ও সুন্নাহ থেকে, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন'।[৬]

---

১. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, ই'লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৩ খৃঃ/১৪১৪ হিঃ), ২/১৪৫ পৃঃ।

২. শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩।

৩. ই'লামুল মুআক্কেঈন ২য় খ-, পৃঃ ৩০৯; ইবনু আবেদীন, হাশিয়া বাহরুর রায়েক্ব ৬ষ্ঠ খ-, পৃঃ ২৯৩; ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৪৬।

৪. শারহু মুখতাছার খলীল লিল কারখী ২১/২১৩ পৃঃ।

৫. আল-খুলাছা ফী আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ১০৮; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (কায়রো : আল-মাকতবাতুস সালাফিয়াহ, ১৩৪৫হিঃ), পৃঃ ২৭।

৬. ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, পৃঃ ২৮।

সুধী পাঠক! উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, তারা কোন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করে যাননি, প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেননি, তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে মর্মেও কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি; বরং দলীলসহ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এক্ষণে আমরা বলতে পারি- হানাফী, মালেকী, শাফেঈ এবং হাম্বলী বলে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে চার খলীফার নামে বাকারিয়া, উমারিয়া, ওছমানিয়া এবং আলিয়া নামে পরিচয় দেয়া কি ভাল ছিল না? কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম এবং তাদের পরবর্তীরা কেন তাঁদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করেননি? অথচ রাসূল (ছাঃ) তাঁদেরকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

(২০) ইমামগণ কোন ভুল করেননি। তারা ছিলেন ভুলের ঊর্ধ্বে। সুতরাং তারা যা বলে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালনযোগ্য।

পর্যালোচনা :

আদম সন্তান হলে তার ভুল হবেই। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ. 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা তওবাকারী'।[৭] তাহলে ইমামগণের ভুল হয়নি এই দাবী অবান্তর। আশ্চর্যজনক হল, রাসূল (ছাঃ) আদম সন্তান হিসাবে তাঁরও ভুল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা অহি নাযিলের মাধ্যমে তা সংশোধন করে দিয়েছেন। সাহো সিজদার বিধান এ জন্যই চালু হয়েছে।[৮] অনুরূপ চার খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবীদেরও ভুল হয়েছে।[৯] বিশেষ করে ওমর (রাঃ) ছাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অনেক বিষয় অজানা ও স্মরণ না থাকার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সঠিক বিষয় জানার পর বিন্দুমাত্র দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিয়েছেন, গোঁড়ামী প্রদর্শন করেননি।[১০] এমনকি আল্লাহ তা'আলা যাকে নির্বাচন করে মুজাদ্দিদ হিসাবে পৃথিবীতে পাঠান, তিনিও ভুল করতে পারেন বলে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[১১]

তাছাড়া অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (ছাঃ) কোন বিধানকে রহিত করেছেন এবং তার স্থলে অন্যটি চালু করেছেন *(বাক্বারাহ ১০৬)*। তখন সেটাই সকল ছাহাবী গ্রহণ করেছেন। গোঁড়ামী করেননি, কোন প্রশ্ন করেননি। তাদের থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি। কারণ ভুল সংশোধন না করে বাপ-দাদা বা বড় বড় আলেমদের দোহাই দেওয়া অমুসলিমদের স্বভাব *(বাক্বারাহ ১৭০; লোকমান ২১)*।

প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য ইমাম ও মুজতাহিদ সবাই ভুলের কথা স্বীকার করে গেছেন এবং ভুলটা বর্জন করে সঠিকটা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) স্বীয় 'কিতাবুল মানখূলে' বলেন, أَنَّهُمَا خَالَفَا أَبَا حَنِيْفَةَ فِيْ ثُلُثَيْ مَذْهَبِهِ 'ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের দুই-তৃতীয়াংশের বিরোধিতা করেছেন'।[১২] মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সাত্তার বলেন, আবু হানীফার নিম্নোক্ত বক্তব্যের কারণে তারা ফাতাওয়া বর্জন করেছেন, ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) বলেন, لَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ 'ঐ ব্যক্তির জন্য আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল নয়, যে জানে না আমরা উহা কোথা থেকে গ্রহণ করেছি'।[১৩]

আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ তাদের উস্তাদের কথা দলীল দ্বারা যাচাই করতে গিয়ে যেগুলোর দলীল পাওয়া যায়নি সেগুলো বর্জন করেছেন।[১৪]

সুধী পাঠক! ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রিয় ছাত্রের চেয়ে কথিত ভক্তরা বেশী ভক্তি দেখাচ্ছে। এভাবে তারা ইমামের নীতি লংঘন করছে, তার নামে উদ্ভট ফৎওয়া প্রচার করছে এবং মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

অতএব আসুন! ইমামগণের যে সমস্ত ফৎওয়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীলের সাথে মিলে যাবে সেগুলো আমল করি এবং তাদের সকলকে শ্রদ্ধা করি। আর যেগুলো মিলবে না সেগুলো বর্জন করি এবং আল্লাহ্র রহমত ও ক্ষমা লাভে ধন্য হই। আল্লাহ বলেন, 'যারা ভুল করার পর তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং চিন্তামুক্ত রাখবেন' *(আন'আম ৪৮, ৫৪)*।

(২১) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য হাদীছের ইমামগণের সিনিয়র। সুতরাং অন্যদের চেয়ে ইমাম আবু হানীফার মাযহাব ও ফাতাওয়াই সঠিক।

পর্যালোচনা :

এটা নিরেট মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য এটি একটি অপকৌশল মাত্র। কারণ শরী'আত গ্রহণের ক্ষেত্রে বয়স ও জ্ঞানকে মাপকাঠি করা হয়নি; বরং যার কাছে সঠিকটা পাওয়া যাবে তার নিকট থেকেই গ্রহণ করতে হবে। হক্ব সকল মানুষের মতামতের ঊর্ধ্বে। তাই তা গ্রহণের ক্ষেত্রে কে ছোট আর কে বড় তা কখনো ছাহাবায়ে কেরাম দেখেননি। যারা হাদীছ সংগ্রহ করেছেন তাদের হাদীছ ছহীহ হলে গ্রহণ করতে হবে। ইমাম বুখারীর সংকলিত ছহীহ হাদীছকে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী ও শরী'আত হিসাবে মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বাস করতেই হবে। বিকল্প কোন পথ নেই। তিনি তার ব্যক্তিগত রায়কে ছহীহ

৭. ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯, ২/৭৬ পৃঃ,; মিশকাত হা/২৩৪১, পৃঃ ২০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩২, ৫/১০৪ পৃঃ।
৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১২২৯, ১/১৬৪ পৃঃ এবং ১/৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৫৭, ২/৩৪৬); মিশকাত হা/১০১৭।
৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কেঈন ২/২৭০-২৭২।
১০. বুখারী হা/৪৪৫৪, ২/৬৪০-৬৪১ পৃঃ, (ইফাব হা/৪১০২, ৭/২৪৪ পৃঃ), 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৩; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৫৩, ২/২১০ পৃঃ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।
১১. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ২/১০৯২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৮৫০, ১০/৫১৮ পৃঃ), 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১; মিশকাত হা/৩৭৩২, পৃঃ ৩২৪।
১২. শারহু বেক্বায়াহ -এর মুক্বাদ্দামাহ (দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপু, তাবি), পৃঃ ৮।
১৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কেঈন আন রাবিক্বল আলামীন (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৯৯৯৩/১৪১৪), ২য় খ-, পৃঃ ৩০৯; ইবনু আবেদীন, হাশিয়া বাহরুর রায়েক্ব ৬ষ্ঠ খ-, পৃঃ ২৯৩; মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ) মিনাত তাকবীর ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহু (রিয়ায : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯১/১৪১১), পৃঃ ৪৬।
১৪. শারহু বেক্বায়াহ -এর মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৮।

বুখারীতে হাদীছ বলে চালিয়ে দেননি। ইমাম বুখারী (রহঃ) সম্পর্কে কেন সমালোচনা করা হয়? আমরা ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর সংকলিত ছহীহ হাদীছকেও গ্রহণ করে থাকি; তাদের ব্যক্তিগত রায়কে নয়। অথচ ইমাম আবু হানীফার চেয়ে ইমাম মালেক মাত্র ১৩ বছরের ছোট। এখানে সিনিয়র জুনিয়রের তারতম্য কী থাকল? ইমাম আবু হানীফার যদি সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ থাকত তবে সেখানকার ছহীহ হাদীছগুলো মানুষ অনুসরণ করত। মনে রাখা আবশ্যক যে, শরী'আত গ্রহণের ক্ষেত্রে কে ছোট কে বড় এর মধ্যে কোন ফারাক নেই। ওমর (রাঃ) কনিষ্ঠ ছাহাবী আবু সাঈদ (রাঃ)-এর হাদীছ গ্রহণ করেছেন।[১৫] আলী (রাঃ) ইবনু আবক্ষাসকে খারেজীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা জানানোর জন্য।[১৬] এ ধরনের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ তাদের উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার দুই-তৃতীয়াংশ ফাতাওয়ার বিরোধিতা করেছেন।[১৭] আর হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা সেটাই মেনে নিয়েছে। এখন চিন্তা করুন ইমাম আবু হানীফা সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা তার ফাতাওয়া বাদ দিয়ে ছাত্রদের কথা গ্রহণ করেছেন?

(২১) পীর ধরা ফরয। যার পীর নেই, তার পীর শয়তান।

পর্যালোচনা :

এটি একশ্রেণীর পথভ্রষ্ট ভ-দের মন্তব্য, যারা বিনা পূজিতে সমাজে শিরকের ব্যবসা করে থাকে। মূর্খ মুরীদদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা খানকা ও মাযারের নামে মরণ ফাঁদ পেতে বসে আছে। পীর ধরা আর মাযহাব মানা এই দু'টি ধোঁকাবাজি একই সূত্রে গাঁথা। যেখানে পীর-মুরীদ নামে শরী'আতে কোন ইঙ্গিত নেই, সেখানে তাকে ফরয করার কোন কারণ থাকতে পারে কি? মূলতঃ উক্ত ব্যবসাকে জমজমাট রাখা এবং সকল মানুষকে উক্ত ফাঁদে বন্দি করার জন্যই উক্ত দাবী করা হয়েছে; বরং যারা পীর-মুরীদের ব্যবসা করছে তারাই যে ইবলীস শয়তানের এজেন্ট তা হাদীছ থেকে স্পষ্ট জানা যায়। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَىْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ بِالشَّىْءِ يَكُوْنُ حَقًّا قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِىْ أُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে একদা লোকেরা গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তরে বললেন, নিশ্চয় তারা কিছু করতে পারে না। লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তারা যা বর্ণনা করে তা কখনো সত্য হয়। তিনি বললেন, উক্ত সত্য কথা মেয়ে জিন ছুঁ মেরে নিয়ে আসে এবং তার ভ-অলীর কানে বলে দেয়, যেভাবে মুরগী করকর করে। অতঃপর তারা তার সাথে একশ'র বেশী মিথ্যা কথা মিশ্রিত করে।[১৮] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِى الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالأَمْرِ يَكُوْنُ فِى الأَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِيْنُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِىْ أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُوْرَةُ فَيَزِيْدُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ.

আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, দুনিয়ায় ঘটবে এমন বিষয় নিয়ে ফেরেশতাম-লী মেঘের মাঝে আলোচনা করেন। তখন কোন কথা শয়তানরা শুনে ফেলে। অতঃপর তা গণকের কানে হুবহু বর্ণনা করে। যেভাবে কাঁচকে স্বচ্ছ করা হয়। অতঃপর তারা ঐ কথার সাথে আরো একশ' মিথ্যা কথা যোগ দেয়।[১৯] অন্য হাদীছে এসেছে, শয়তানরা একজনের উপর আরেকজন উঠে। এভাবে আসমানের কাছাকাছি গিয়ে উক্ত কথা শ্রবণ করে এবং উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।[২০]

অতএব ভ- ফকীরেরা যে ইবলীস শয়তানের স্পেশাল এজেন্ট, তা উক্ত হাদীছগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাই ঈমান বাঁচানোর স্বার্থেই তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

(২২) পীরের মুরীদ হলে ছালাত, ছিয়াম ও হজ্জ করা লাগে না। কবরে সওয়াল-জওয়াব হবে না। ক্বিয়ামতের মাঠে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

পর্যালোচনা :

এই সমস্ত নোংরা কথা মানুষের মুখ থেকে কিভাবে বের হয়, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। রাসূল (ছাঃ) হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রাসূল। আর ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ কেবল তাঁরই সুপারিশ কবুল করবেন। কোন নবীর পক্ষে সেদিন কারো জন্য সুপারিশ করা সম্ভব হবে না। এরপরও ছাহাবীদেরকে এমনকি তাঁর মেয়ে ফাতেমাকে পর্যন্ত উক্ত প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। বরং নিজ নিজ বাঁচার জন্য সতর্ক করেছেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللَّهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلاَنِى مِنْ مَالِى مَا شِئْتُمَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে আব্দে মানাফ সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। হে আব্দুল মুত্ত্বালিবের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। হে উম্মে যুবাইর এবং

১৫. ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৫৩, ২/২১০ পৃঃ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।
১৬. আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক, পৃঃ ৬১।
১৭. শারহু বেক্বায়াহ-এর মুক্বাদ্দামাহ (দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপু, তাবি), পৃঃ ৮।

১৮. বুখারী হা/৭৫৬১; মিশকাত হা/৪৫৯৩।
১৯. বুখারী হা/৩২৮৮; মিশকাত হা/৪৫৯৪।
২০. বুখারী হা/৪৮০০; মিশকাত হা/৪৫০০।

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মেয়ে ফাতেমা! তোমরা দুইজন আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। তোমাদের জন্য আল্লাহ্র সামনে আমি কোনই উপকার করতে পারব না। সুতরাং আমার সম্পদ থেকে যা প্রয়োজন তা তোমরা গ্রহণ কর।[২১]

তাছাড়া ছাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য কত পরিশ্রম করেছেন তা কি উল্লেখ করা সম্ভব? জিহাদের ময়দানে শহীদ হওয়াসহ নানা নির্যাতন, অপমান ভোগ করার পরও তারা কি উক্ত মর্মে ফৎওয়া পেয়েছেন?

ক্বিয়ামতের মাঠে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার যে প্রলোভন দেখানো হয় তা শয়তানী ওসওয়াসা ছাড়া কিছু নয়। কারণ তাদেরই যে পরিণতি হবে তা তারা কখনো ভাবেনি। অনুরূপ মুরীদরাও চিন্তা করেনি। আল্লাহর ভাষায় শুনুন-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ- إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ- وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ

'মানুষের মধ্যে এরূপ কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে। তবে যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে অত্যধিক ভালবাসে। আর যারা অত্যাচার করেছে, তারা যদি শাস্তি দেখতে পেত, তবে বুঝতে পারত- যাবতীয় ক্ষমতার উৎস আল্লাহই এবং আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। যখন নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীরা বলবে, আমরা যদি ফিরে যেতে পারতাম, তবে তারা যেমন আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহকে দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করাবেন। আর তারা কখনো জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে না' *(বাক্বারাহ ১৬৫-৬৭)*।

সুধী পাঠক! যে সমস্ত ভক্ত তাদের পীর-ফকীরকে আল্লাহ্র আসনে বসিয়েছে, তাদের অবস্থা কী হবে তা উক্ত আয়াতে ফুটে উঠেছে। অথচ কথিত প্রভুরা যেমন সতর্ক নয়, তেমনি ভক্তরাও সচেতন নয়।

(২৩) পীরের দরগায় দান করলে সব পাপ ক্ষমা হয়ে যায় এবং সকল বিপদ দূর হয়ে যায়।

অসংখ্য মানুষ দুর্নীতি, আত্মসাৎ ও অবৈধ পথে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে আর তা থেকে বাঁচার জন্য কিছু অংশ মাযার, খানকা ও পীরের দরগায় দান করে থাকে। অনুরূপ কোন বিপদে পড়লে বা কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে দরগায় গরু, খাসি, উট, দুম্বা মানত করে।

পর্যালোচনা :

সম্পদশালী একশ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি এ ধরনের বাজে কাজে জড়িত। এরা অধিকাংশই ছালাত আদায় করে না, ছিয়াম পালন করে না। অর্থাৎ কোন নিয়মিত ইবাদতের সাথে জড়িত নয়। তারা এরূপ প্রতারণা করেই দিন অতিবাহিত করে থাকে। একদিকে তার আয়ের পথ অবৈধ, অন্যদিকে এটাকে দান হিসাবে ব্যবহার করছে। এছাড়া শিরকের আড্ডাখানায় দান করছে এবং শিরকের উৎপাদন কেন্দ্রকে জোরদার করছে।

অবৈধ পথে সম্পদ উপার্জন করা যেমন অন্যায়, তেমনি অবৈধ সম্পদ থেকে সামান্য অংশ দান করাও প্রতারণার শামিল। يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا 'হে মানবমণ্ডলী! যমীনের যা বৈধ তা খাও' *(বাক্বারাহ ১৬৮)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ তা হতে বৈধ বস্তু থেকে খরচ কর' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِّنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَيَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

'যে ব্যক্তি তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করবে- কারণ আল্লাহ হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা প্রতিপালন করতে থাকেন, যেরূপ তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করতে থাকে। অবশেষে তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়'।[২২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقلام وجفَّت الصُّحُف.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন, হে বৎস! আল্লাহ্র অধিকার সংরক্ষণ কর, আল্লাহও তোমাকে সংরক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর, তোমার প্রয়োজনে তাঁকে পাবে। যখন তুমি চাইবে আল্লাহ্র কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য চাইবে। তুমি জেনে রাখ! সমস্ত মানুষ যদি তোমার উপকার করার চেষ্টা করে তারা সক্ষম হবে না, যদি আল্লাহ তা তোমার জন্য নির্ধারণ না করেন। আর যদি সকলে কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, আল্লাহ যদি তা নিধারণ না করেন, তাহলে তারা পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং খাতা বন্ধ করা হয়েছে।[২৩] *(চলবে)*

২১. বুখারী হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/৫৩৭৩।

২২. বুখারী হা/১৪১০, 'যাকাত' অধ্যায়।

২৩. তিরমিযী হা/২৫১৬, 'ক্বিয়ামতের বিবরণ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫৯; মিশকাত হা/৫৩০২, সনদ ছহীহ।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যুবকদের অবদান

-আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

(২য় কিস্তি)

৬. আল্লাহ্র রাস্তায় নাক-কান কর্তিত যুবক আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রাঃ) :

আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হয়ে পরকালে উচ্চ মর্যাদা লাভের আশায় ওহোদ যুদ্ধে নামার আগের দিন হামযার ভাগিনা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই যুবক আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রাঃ) দো'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে কালকে এমন একজন বীর যোদ্ধার মুখোমুখি কর, যে আমাকে প্রচ- লড়াই শেষে হত্যা করবে এবং আমার নাক ও কান কেটে দেবে। তারপর আমি তোমার সামনে হাযির হলে তুমি বলবে, হে আব্দুল্লাহ! তোমার নাক ও কান কাটা কেন? আমি বলব, হে আল্লাহ! তোমার জন্য ও তোমার রাসূলের জন্য (فيك وفي رسولك)। তখন তুমি বলবে, صدقت 'তুমি সত্য বলেছ'। এ দো'আর সত্যায়ন করে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমার চেয়ে তার দো'আ উত্তম ছিল এবং সেভাবেই তিনি শাহাদত লাভে ধন্য হয়েছেন। এ জন্য তাকে المجدع في الله 'আল্লাহ্র রাস্তায় নাক-কান কর্তিত' নামে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে হামযাহ ও আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রাঃ) দু'জনকে একই কবরে দাফন করেন।[২৪]

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) শহীদী মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রত্যেক মুমিন মুসলিম যুবকের একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় মুনাফিক্বী হালাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

(খ) দুনিয়াবী জীবন মুসলিমদের নিকট তুচ্ছ। পরকালের উচ্চ মর্যাদাই তাদের একমাত্র কাম্য।

(গ) পরকালীন উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকট সর্বদা দো'আ করতে হবে।

৭. হক্ব ও বাতিলের পার্থক্যকারী ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) :

৬ষ্ঠ নববী বর্ষের শেষ দিকে যিলহজ্জ মাসের কোন একদিনে হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র তিনদিন পরেই আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী পুরুষ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আকস্মিকভাবে মুসলিম হয়ে যান। তিনি ছিলেন চল্লিশতম মুসলিম। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ দো'আর বরকত। হাদীছে এসেছে, ইবনু আবক্ষাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করেছিলেন, اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَبِى جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ. 'হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনু হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর'। এই দো'আর পরদিন ওমর ভোরে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং কা'বা গৃহে গিয়ে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করলেন।[২৫] অতঃপর ওমরের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, তিনিই আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর প্রিয়। ছাফা পাহাড়ের পাদদেশের গৃহে যখন ওমর ইসলাম কবুল করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও গৃহবাসীগণ এমন জোরে তাকবীর ধ্বনি করলেন যে, মসজিদুল হারাম পর্যন্ত তা পৌঁছে গিয়েছিল।[২৬]

ইসলাম কবুলের পরপরই ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জাহলের গৃহে গমন করলেন এবং তার দরজায় করাঘাত করলেন। তখন আবু জাহল বের হয়ে এসে বলল, أهلا و سهلا ما جاء بك؟ 'স্বাগতম, তোমার আসার কারণ কী? ওমর (রাঃ) কোন ভূমিকা না দিয়ে তার মুখের উপর বলে দিলেন যে, 'আমি তোমার কাছে এসেছি এ খবর দেওয়ার জন্য যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান এনেছি এবং তিনি যে শরী'আত এনেছেন তা সত্য বলে জেনেছি'। একথা শুনে আবু জাহল সরোষে তাকে গালি দিয়ে বলে উঠল, 'আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং তুমি যে খবর নিয়ে এসেছ তার মন্দ করুন'। অতঃপর সে দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে গেল। এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে লোক জমা হয়ে সকলেই ওমরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং গণপিটুনী শুরু করল। এই মারপিট চলল প্রায় দুপুর পর্যন্ত। এ সময় কাফিরদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'যদি আমরা সংখ্যায় তিনশ' পুরুষ হতাম, তবে দেখাতাম এরপর মক্কায় তোমরা থাকতে না আমরা থাকতাম'। এই ঘটনার পর নেতারা হত্যা করার উদ্দেশ্যে ওমরের বাড়ী আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। তিনি ঘরের মধ্যেই ছিলেন। কিন্তু 'আছ ইবনু ওয়ায়েল সাহমীর প্রচেষ্টায় লোকজন সেখান থেকে ফিরে গেলে ওমর (রাঃ) রাসূলের খিদমতে হাযির হয়ে বললেন,

يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق وإن متم وإن حييتم قال قلت ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن.

'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি হক্বের উপরে নই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয় তোমরা সত্যের উপর আছ, যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর কিংবা জীবিত থাক। ওমর (রাঃ) বললেন, তাহলে লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন কী! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, অবশ্যই আমরা প্রকাশ্যে বের হব'। অতঃপর রাসূলকে মাঝখানে রেখে দুই সারির মাথায় ওমর ও হামযার নেতৃত্বে মুসলিমগণ প্রকাশ্যে মিছিল সহকারে মসজিদুল হারামে উপস্থিত হলেন। এ সময় দূরে দ-ায়মান

২৪. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৮১, আত-তাহরীক ১৪/১০ জুলাই ২০১১, পৃঃ ৫-৬।

২৫. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৪৫, 'মানাক্বিব' অধ্যায় ৩০ 'ওমর (রাঃ)-এর মানাক্বিব' অনুচ্ছেদ ৪।

২৬. আর রাহীকুল মাখতূম, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ১০৪, আত-তাহরীক ১৪/২ নভেম্বর ২০১০, পৃঃ ৪।

কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ ও জনতাকে লক্ষ্য করে ওমর (রাঃ) নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেছিলেন,

مالي ارا كم كلكم قياما * الكهل و الشبان والغلاما

قد بعث الله الينا رسولنا * محمدا قد شرع الاسلام

‘এই দিন আমাকে ও হামযাকে মুসলমানদের মিছিলের পুরোভাগে দেখে কুরায়েশ নেতারা যতবেশী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, এমন আঘাত তারা কখনোই পায়নি’।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিনই ওমর (রাঃ)-কে ফারূক (الفاروق) বা ‘হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী’ উপাধিতে ভূষিত করেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, ما كنا نقدر ان نصلي عند الكعبة حتي اسلم عمر وقال ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر ‘ওমরের ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমরা কা‘বা গৃহের নিকট ছালাত আদায় করতে সক্ষম হইনি’। তিনি আরো বলেন, ‘ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা সর্বদা শক্তিশালী ও সম্মানিত ছিলাম’। ছুহায়েব বিন সিনান আর-রূমী (রাঃ) বলেন, ‘ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরের জগতে প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। মানুষকে ইসলামের দিকে প্রকাশ্যে আহ্বান জানানো সম্ভব হয়। আমরা গোলাকার হয়ে কা‘বা গৃহের পাশে বসতে পারতাম এবং ত্বাওয়াফ করতে পারতাম। যারা আমাদের উপর কঠোরতা দেখায় তাদের প্রতিশোধ নিতাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতাম’।[২৭]

ওমর (রাঃ) ছিলেন সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী, মুমিনদের প্রতি অতীব দয়ালু। পক্ষান্তরে কাফের, বেদ্বীন ও অনৈসলামিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর। শয়তান তাঁকে দেখলে ভিন্ন পথে চলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ ‘(হে ওমর!) যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি, শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখে, সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে’।[২৮]

ন্যায়পরায়ণ, সাহসী ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে মুসলিম জাহানে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তিনি যে বিরাট অবদান রেখেছেন তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তাঁর শাসনামলে মানুষ সর্বত্র সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করেছেন। ওমর (রাঃ) ছিলেন খুবই দূরদর্শী এবং প্রজাহিতৈষী। জনসাধারণের অবস্থা জানার জন্য তিনি রাত্রিতে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি এক রাতে একটি ছোট কুটিরের সামনে এলে বাড়ীর ভিতরের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। মা মেয়েকে আদেশ করছেন, দুধের সাথে পানি মিশাও। ভোর হয়ে এল। মেয়েটি উত্তর দিল, ‘না মা, ওমর (রাঃ) দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানতে পারলে শাস্তি দিবেন’। মা বললেন, ‘ওমর দেখতে পেলে তো’? মেয়ে বলল, ‘আমি প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্য করব আর গোপনে তাঁর অবাধ্যতা করব? আল্লাহ্র কসম! এটা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সে বলল, ‘ওমর (রাঃ) হয়ত আমাদেরকে দেখছেন না, কিন্তু তাঁর প্রভুতো আমাদেরকে দেখছেন’! গোপনে সব শুনে ওমর (রাঃ) বাড়ীটি চিহ্নিত করে ফিরে এলেন। পরে তাঁর ছেলে ‘আছেমের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ দিলেন। তার গর্ভে দু’টি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছিল, যাদের একজনের গর্ভে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর জন্ম হয়েছিল।[২৯]

সারাজীবন হক্বের পথে অটল থেকে ওমর (রাঃ) ২৩ হিজরীর ২৭ যিলহজ্জ মাসে মসজিদে নববীতে জামা‘আতে ফজর ছালাতরত অবস্থায় কুখ্যাত খারেজী আবু লুলু কর্তৃক ছুরি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হন। তার তিনদিন পর তিনি শাহাদত বরণ করেন।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(ক) জাহেলী যুগে যুবকদের ইসলাম গ্রহণ ও তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমেই আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ঘর কা‘বাতে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় শুরু হয়েছে। তাই আল্লাহ্র ঘরসমূহ ও যমীন আবাদ করার জন্য যুবকদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে।

(খ) নিজের সুখ শান্তির কথা সর্বদা না ভেবে প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে ইসলামী নেতাদের।

(গ) মানুষের অন্তরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করতে হবে।

(ঘ) গোপনে ও প্রকাশ্যে তাক্বওয়াশীল আমীরের আনুগত্য করা।

(চলবে)

[লেখক : কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

২৭. আর রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১০৫; বুখারী হা/৩৮৬৩, আত-তাহরীক ১৪/২ নভেম্বর ২০১০ পৃঃ ৫।

২৮. মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩৬।

২৯. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক্ব ৭০/২৫৩।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ ও হেফয বিভাগ

দারুল হাদীছ একাডেমী, নারায়ণগঞ্জ

ইসলামী আক্বীদা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যত বংশধরদের গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে রাজধানী ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জে ‘দারুল হাদীছ একাডেমী’ গত মার্চ ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করেছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ। এক্ষণে আগামী **১ রামাযান থেকে ২৯ রামাযান** পর্যন্ত সাধারণ ও হেফয বিভাগে আবাসিক/অনাবাসিক ছাত্র ভর্তি নেওয়া হবে।

অতএব আপনার সন্তানকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে একজন খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলুন।

যোগাযোগ : বাংলাবাজার, বড় দেওভোগ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯১৯-৬৯৯৮১৮, ০১৬৮৯-৮৮৭৪৯০।

পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার

-বযলুর রহমান

ওযূর শিষ্টাচার

ওযূর পরিচিতি : আভিধানিক অর্থ স্বচ্ছতা (الوَضَـــاءَةُ)। পারিভাষিক অর্থে পবিত্র পানি দ্বারা শারঈ পদ্ধতিতে হাত, মুখ, পা ধৌত করা ও (ভিজা হাতে) মাথা মাসাহ করাকে ওযূ বলে।[৩০]

ওযূর ফযীলত (فضائل الوضوء) :

(أ) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে বলে দেব না, যে কারণে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ সমূহ মুছে দিবেন এবং তোমাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করবেন? (ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন,) কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে অধিকহারে গমন করা এবং এক ছালাত শেষ করার পর অপর ছালাতের অপেক্ষায় থাকা। আর এটিই 'রিবাত', এটিই 'রিবাত', এটিই 'রিবাত'।[৩১]

(ب) إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

(খ) ইসহাক্ব ইবনু সাঈদ (রহঃ) তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। অতঃপর তিনি ওযূর পানি আনতে বললেন এবং বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন কোন মুসলমানের নিকট ফরয ছালাত উপস্থিত হয়, তখন সে উত্তমরূপে ওযূ করে। অতঃপর বিনয়-নম্রভাবে সুন্দর করে ছালাত আদায় করে, তাহলে সে ছালাত তার পূর্বের সমস্ত (ছগীরা) গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে পুনরায় কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আর এটা সব সময় হয়ে থাকে।[৩২]

(ج) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

(গ) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আমার উম্মতকে ক্বিয়ামতের দিন ডাকা হবে (জান্নাতের দিকে) পঞ্চকল্যাণ ঘোড়ার (উজ্জ্বল হাত, মুখ ও পা-এর) ন্যায় তাদের ওযূর আলামতের কারণে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতা বাঁড়াতে চায়, সে যেন তা করে।[৩৩]

(د) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

(ঘ) ওছমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করে, তার গুনাহ সমূহ তার শরীর থেকে বাহির হয়ে যায়; এমনকি তার নখের নিচ হতেও গুনাহ সমূহ ঝরে যায়।[৩৪]

(ه) عَنْ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

(ঙ) ওক্ববাহ ইবনু 'আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলিম যদি উত্তমরূপে ওযূ করে অন্তর ও চেহারাকে (আল্লাহ্র দিকে খুশু-খুযূভাবে) নত করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৩৫] অন্য রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, 'দু'ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[৩৬]

১. নিয়ত করা :

---

৩০. উল্লেখ্য যে, ওযূ (الوضوء) শব্দের 'و' বর্ণটি তিন ভাবে পড়া যায়। যেমন- الوضـــوء এর 'و' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, ওযূ করা। আর 'و' বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, ওযূর পানি। আর 'و' বর্ণে যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, পানির পাত্র। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৩১. নাসাঈ ১/১৮ পৃঃ, হা/১৪৩; মুসলিম ১/১২৭ পৃঃ, হা/৬১০; মিশকাত হা/২৮২-৮৩; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৩, ২/৩৮-৩৯ পৃঃ। উল্লেখ্য যে, 'রিবাত' বলা হয় সীমান্তের অতন্দ্রপ্রহরীকে। আর এখানে ওযূ হল মানুষের মনের অতন্দ্রপ্রহরী। যা যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নফসকে রক্ষা করে।

৩২. মুসলিম হা/৫৬৫; মিশকাত হা/২৮৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৬, ২/৪০ পৃঃ।

৩৩. বুখারী হা/১৩৬, ১/২৫ পৃঃ; মুসলিম ১/১২৬ পৃ:, হা/৬০৩; মিশকাত হা/২৯০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৭০,২/৪২ পৃঃ।

৩৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম ১/১২৫ পৃঃ, হা/৬০১; মিশকাত হা/২৮৪-৮৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৪-৬৫, ২/৩৯ পৃঃ।

৩৫. মুসলিম হা/৫৭৬; মিশকাত হা/২৮৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৮,২/৪১ পৃঃ।

৩৬. من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينه- নাসাঈ ১/১৮ পৃঃ, হা/১৪৫, সনদ ছহীহ।

মানুষের যাবতীয় কাজ সংগঠিত হয় তার নিয়তের উপর ভিত্তি করে। মানুষ যা নিয়ত করে তাই পায়। নিয়ত (النيـــات) আরবী শব্দ। অর্থ অন্তরের সংকল্প।[৩৭] সুতরাং নিয়ত হল অন্তরে সংকল্প করার নাম, যা প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা যাবে না। শুধুমাত্র হজ্বের তালবিয়া ছাড়া।

عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সে যা নিয়ত করে তাই পাই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভ ও কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তার হিজরত সে দিকেই গণ্য হবে যে দিকে সে হিজরত করেছে।[৩৮] উল্লেখ্য প্রচলিত আরবী বাক্যে তৈরী নিয়তের শরী'আতে কোন ভিত্তি নেই।[৩৯] সুতরাং তা অবশ্যই পরিতাজ্য।

২. পবিত্র পানি দ্বারা ওযূ করা :

ওযূর জন্য পবিত্র পানি নির্ধারণ করা যরূরী। যদিও পানি নিজেই পবিত্র ও পবিত্রকারী। কোন বস্তু তাকে অপবিত্র করতে পারে না।[৪০] এছাড়া মুহাদ্দিছগণ তাদের সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ সমূহে পানি সম্পর্কে অর্থাৎ পানির পবিত্রতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। ইমাম আবুদাঊদ (২০২-২৭৫ হিঃ) (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে ৯ পৃষ্ঠা থেকে ১৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ৫ পৃষ্ঠায় ১১টি অনুচ্ছেদে মোট ২৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০২হিঃ) (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে ৮ পৃষ্ঠা থেকে ১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ৪ পৃষ্ঠায় ১৭টি অনুচ্ছেদে মোট ২৪টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনু মাজাহ (২০৯-২৭১ হিঃ) (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে ৩০ পৃষ্ঠা থেকে ৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ৩ পৃষ্ঠায় ৮টি অনুচ্ছেদে মোট ২৯টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সমূহে এ বিষয়ে আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর জন্য পবিত্র পানি নির্ধারণ করা আবশ্যক। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণীর পানি পান করার জন্য বারবার আগমন এবং তার যথেচ্ছা ব্যবহৃত পানির হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, উক্ত পানি দুই কুল্লা[৪১] পরিমাণের বেশী হলে তা অপবিত্র হবে না।[৪২] সুতরাং পবিত্র পানি দ্বারা ওযূ করতে হবে। এটাই শরী'আতের বিধান।

৩. পানির অপচয় না করা :

বিশ্ব মানবতার জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নে'মতরাজির মধ্যে পানি অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। পানি ছাড়া কোন সৃষ্টিজীব এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে না। তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপচয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা অপচয় বা অপব্যয় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 'নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৭)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ أَفِي الْوَضُوءِ سَرَفٌ؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম (ছাঃ) সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি (সা'দ) ওযূ করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, হে সা'দ! এটা কেমন অপচয়? সা'দ (রাঃ) বললেন, ওযূতেও কী অপচয় আছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি সমুদ্রে ওযূ কর।[৪৩]

ওযূতে পানির পরিমাণ কী হবে সে সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) বলেন,.. كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُد 'নিশ্চয় নবী করীম (ছাঃ) এক 'ছা' পানি দিয়ে গোসল এবং এক 'মুদ' পানি দিয়ে ওযূ করতেন'।[৪৪] উল্লেখ্য, এক 'মুদ' সমান ৬০০ গ্রাম এবং

৩৭. মু'জামুল ওয়াসীত্ব ২/৯৬৬ পৃঃ।

৩৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১; নাসাঈ ১/১১ পৃঃ, হা/৪৫।

৩৯. মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম (তাবি), প্রশ্ন নং-২২২, পৃঃ ৬৭ 'ছালাত সংক্রান্ত ফাতাওয়া সমূহ' অধ্যায়।

৪০. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২হিঃ), বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (রিয়ায : মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ) হা/২, পৃঃ ১০, সনদ ছহীহ।

৪১. মাটির তৈরী বড় পাত্রকে বুঝায়, যা ২২৭ কেজির সমান। বুলূগুল মারাম ১১ পৃঃ, হা/৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪২. আবুদাঊদ হা/৬৩; তিরমিযী ১/৯৭ পৃঃ, হা/৬৭; নাসাঈ ১/৯ পৃঃ, হা/৫২; বুলূগুল মারাম হা/৪,সনদ ছহীহ।

৪৩. 'আওনুল মা'বুদ ১/১১৮ পৃঃ, মিশকাত হা/৪২৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৯৩, ২/৮৯ পৃঃ, সনদ হাসান।

৪৪. বুখারী ১/৩৩ পৃঃ, হা/২০১।

এক 'ছা' সমান ৪/৫ মুদ পরিমাণ পানিকে বুঝায়।[৪৫] বর্তমানে আধুনিকতার চরম উৎকর্ষতার যুগে ওযূ বা গোসলে অতিরিক্ত পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গোসলখানার ঝর্ণায় অথবা পানির ট্যাপে অসাবধানবশতঃ গোসল বা ওযূ করার কারণে সাধারণত এমনটি হয়ে থাকে। অথচ পানি স্বল্পতার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেক ছাহাবী পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে মাটিতে গড়াগড়ি পর্যন্ত দিয়েছেন। যদিও সঠিক পদ্ধতি পরে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৪৬] অতএব অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছণীয়।

৪. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে হাত ধৌত করার পূর্বে পানির পাত্রে হাত না ডুবানো :

ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ভালভাবে তিনবার হাত পরিষ্কার না করে ওযূর পানির পাত্রে হাত ডুবানো ঠিক নয়। কেননা ঘুমন্তাবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক থাকে না। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা ঘুমন্ত ব্যক্তির জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর থেকে সকল বিষয়ের কলম উঠিয়ে নিয়েছেন।[৪৭] হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তিনবার হাত পরিষ্কার না করে যেন পানির পাত্রে হাত না ডুবায়। কেননা সে জানে না তার হাত দু'টি কোথায় রাত্রি যাপন করেছিল।[৪৮]

৫. ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা :

ওযূর শুরতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) (১৬১-২৪১হিঃ) বলেন, ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। এটি ছাড়া ওযূ বিশুদ্ধ হবে না।[৪৯] নওয়াব ছিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) একে 'ফরয' বলে অভিহিত করেছেন।[৫০] হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

৪৫. বঙ্গানুবাদ ছহীহুল বুখারী (ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ-২০০৩) ১/১১৪ পৃঃ, হা/২০১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৬. বুখারী ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩৬; আবুদাঊদ ১/৪৭ পৃঃ, হা/৩২২।

৪৭. رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ-আবুদাঊদ হা/৪৪০৩; ইবনু মাজাহ হা/২০৪১; তিরমিযী হা/১৪২৩; মুসনাদে আহমাদ হা/১১৮৩; মিশকাত হা/৩২৮৭; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর (রহঃ), তাফসীরে কুরআনুল আযীম (আল মাদীনাতুল মুনাওয়ারা : মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ) ২/২১৫ পৃঃ, সূরা নিসার ৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

৪৮. আবুদাঊদ ১/১৪ পৃঃ, হা/১০৩; নাসাঈ ১/৩, হা/১; ইবনু মাজাহ ১/৩২ পৃঃ, হা/৩৯৩-৩৯৪, সনদ ছহীহ; মুসলিম ১/১৩৬ পৃঃ, হা/৬৬৫; মিশকাত হা/৩৯১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬১, ২/৭৭ পৃঃ।

৪৯. انه واجبة لا يصح الوضوء الا بها-'আওনুল মা'বুদ ১/১২১ পৃঃ, হা/১০১-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫০. আর রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/১১৭ পৃঃ, গৃহীত : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৫৯ পৃঃ, টীকা-১৭৩ দ্রষ্টব্য।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছালাত হয় না ওযূ ছাড়া আর ওযূ হয় না বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া।[৫১]

৬. ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করা :

ডান দিক ইতিবাচক ইঙ্গিতের পরিচয়। ওযূ সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ভাল কাজ ডান দিক দিয়ে আরম্ভ করতে ভালবাসতেন।[৫২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوابِأَيْمانِكُمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা পোশাক পরিধান করবে অথবা ওযূ করবে তখন ডান দিক থেকে আরম্ভ করবে।[৫৩]

৭. ওযূর অঙ্গগুলো এক, দুই ও তিনবার পর্যন্ত ধৌত করা :

ওযূর সময় ওযূর অঙ্গগুলো এক, দুই অথবা তিনবার পর্যন্ত ধৌত করা যায়। এ সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً وفي رواية مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وفي رواية ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

আব্দুল্লাহ ইবনু আবক্ষাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) (ওযূর সময় ওযূর অঙ্গগুলো) এক, দুই অথবা তিনবার করে ধৌত করতেন।[৫৪] উল্লেখ্য যে, ওযূর অঙ্গগুলো তিনবারের বেশী ধৌত করা বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.

আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে অতঃপর তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযূ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে ওযূর অঙ্গগুলো তিন-তিনবার ধৌত করে দেখালেন। অতঃপর বললেন, এভাবেই ওযূ করতে হয়। যে ব্যক্তি এর

৫১. আবুদাঊদ ১/১৪ পৃঃ, হা/১০১, ১০২; ইবনু মাজাহ ১/৩২-৩৩ পৃঃ, হা/৩৯৭-৩৯৯; মিশকাত হা/৪০২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭০, ২/৮২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৫২. كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ-মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৮, ২/৮১ পৃঃ।

৫৩. মুসনাদে আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০১, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৯, ২/৮১ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৫৪. বুখারী ১/২৭-২৮ পৃঃ, হা/১৫৭-১৫৯; মিশকাত হা/৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৩, ৬৪, ৬৫; ২/৮০ পৃঃ।

অতিরিক্ত করল সে অন্যায় ও যুলুম করল।[৫৫] তাছাড়া নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেছেন, 'এটি (ওযূতে তিনবারের অধিক ধৌত করা) বিদ'আত'।[৫৬] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَإِنَّمَا تَكُونُ الرَّابِعَةُ بِدْعَةً وَمَكْرُوهَةً 'চতুর্থবার ধৌত করা বিদ'আত ও অপসন্দীয়'।[৫৭]

৮. পূর্ণরূপে ওযূ করা :

ওযূর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণরূপে ধৌত করতে হবে। কেননা ওযূর স্থান শুকনো থাকলে তা জাহান্নামের কারণ হবে।[৫৮] হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

'আ-ছেম ইবনু লাক্বীত ইবনু ছাবরাহ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ওযূ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ওযূতে ওযূর সমস্ত স্থান পূর্ণরূপে ধৌত করবে, আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে এবং নাকে উত্তমরূপে পানি পৌঁছবে; যদি তুমি ছিয়াম পালনকারী না হও।[৫৯]

৯. ওযূর পর গুপ্তাঙ্গের দিকে পানি ছিটানো :

ওযূ করার পর লজ্জাস্থান বরাবর কাপড়ের উপর[৬০] পানি ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে সন্দেহ দূরীভূত হয়।[৬১] হাদীছে বলা হয়েছে, كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَإِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ওযূ শেষ করতেন তখন তাঁর লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিতেন'।[৬২]

১০. ওযূর পর দো'আ পাঠ করা :

ওযূর যাবতীয় কার্যক্রম পরিসমাপ্তির পর আল্লাহ্র প্রশংসামূলক একটি দো'আ পাঠ করতে হয়, যার ফযীলত অনেক বেশী।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করে। অতঃপর বলে যে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। অতঃপর আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর'। তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা সবকটি খুলে দেওয়া হবে। যেটা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে।[৬৩]

১১. ওযূর যাবতীয় আহকাম ছহীহ দলীল ভিত্তিক হওয়া :

ইসলামী শরী'আতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম ছহীহ দলীল ভিত্তিক হতে হবে। কেননা প্রমাণহীন বিষয় অপূর্ণাঙ্গ ও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা যারা জানে তাদের নিকট থেকে যারা জানে না তাদেরকে জেনে নেওয়ার তাকীদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ... 'সুতরাং যারা জানে না তারা আহলুয যিকর বা জ্ঞানীদের নিকট থেকে শক্ত দলীল সহকারে জেনে নাও' *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে হুমকীস্বরূপ বলেন, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ- لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. 'অতঃপর যদি তিনি (নবী ছাঃ) নিজের কোন কথা আমার কথা বলে প্রচার করতেন, তাহলে আমি তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং মস্তক শাহরগ থেকে দ্বিখণ্ডিত করে দিতাম' *(হা-ক্কাহ ৬৯/৪৪-৪৬)*।

সুধী পাঠক! যার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করা সত্ত্বেও দলীল-প্রমাণহীন ও মনগড়া কথা না বলার জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেন তখন আমাদের মত গুনাহগার বান্দার পক্ষে এমন কথাটা ভাবা বা বলা কোন মতেই উচিত নয়; বরং তা পাপ হিসাবে পরিগণিত হবে। অতএব ওযূর যাবতীয় আহকাম ছহীহ দলীল ভিত্তিক হতে হবে। কেননা ছালাতের চাবি হল ওযূ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ 'ছালাত হয় না ওযূ ছাড়া'।[৬৪] *(চলবে)*

---

৫৫. নাসাঈ ১/১৮ পৃঃ, হা/১৪০ 'ওযূতে সীমালংঘন' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ ১/৩৪ পৃঃ, হা/৪২২, সনদ ছহীহ।

৫৬. শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ (কুয়েত, প্রথম সংস্করণ ২০০২ খ্রিঃ/১৪২৩ হিঃ) ১/২৩০ পৃঃ, হা/১২৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

৫৭. শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ফাতাওয়াউল ইসলাম সাওয়াল ওয়াল জাওয়াব (তাবি), প্রশ্ন নং-৭১১৬৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫৮. رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ- আবুদাঊদ ১/১৩ পৃঃ, হা/৯৭; তিরমিযী ১/৫৮ পৃঃ, হা/৪১; মিশকাত হা/৩৯৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৬৬, ২/৮০ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৫৯. আবুদাঊদ ১/১৯ পৃঃ, হা/১৪২ 'নাক পরিষ্কার করা' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ ১/১২ পৃঃ, হা/৮৭ 'নাকে ভালভাবে পানি দেওয়া' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪০৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭১; ২/৮২ পৃঃ, 'ওযূর নিয়ম ও সুন্নাত সমূহ' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

৬০. الانتضاح رش الماء على الثوب -'আওনুল মা'বুদ ১/১৯৬ পৃঃ, হা/১৬৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬১. মুসনাদে ত্বয়ালিসিয়াহ ১/২৩৯ পৃঃ।

৬২. আবুদাঊদ ১/২২ পৃঃ, হা/১৬৬; নাসাঈ ১/১৭ পৃঃ, হা/১৩৪-১৩৫; ইবনু মাজাহ ১/৩৬ পৃঃ, হা/৪৬১,৬২,৬৪; মিশকাত হা/৩৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৩৮, ২/৬৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৬৩. তিরমিযী ১/৭৭-৭৮ পৃঃ, হা/৫৫; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৬, ৫৭৭; আবুদাঊদ ১/২২-২৩ পৃঃ, হা/১৬৯; ইবনু মাজাহ ১/৩৬ পৃঃ, হা/৪৬৯-৪৭০; মিশকাত হা/২৮৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৯, ২/৪১-৪২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

৬৪. আবুদাঊদ ১/১৪ পৃঃ, হা/১০১; ইবনু মাজাহ ১/৩২ পৃঃ, হা/৩৯৭-৩৯৯; মিশকাত হা/৪০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩৭০, ২/৮২ পৃঃ, সনদ ছহীহ।

শিরক ও তার ভয়াবহ পরিণতি : পর্ব-২

-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

(২য় কিস্তি)

শিরকে খাফী বা গোপন শিরক :

শিরকে খাফী বা গোপন শিরক হচ্ছে সে সব শিরক, যার মধ্যে আল্লাহ এবং সৃষ্টির মাঝে সমকক্ষতার গন্ধ পাওয়া যায়। তবে তা শিরকে আকবার না শিরকে আছগার তা নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এ জন্য যে, ব্যক্তির মুখের কথা ও তার অন্তরে কি ইচ্ছা রয়েছে তা জানার কোন উপায় নেই।[৬৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের শিরকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'এটা পিপীলিকার ধীর পদক্ষেপের চেয়েও গোপন'।[৬৬]

কর্তাব্যক্তির মনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রকার শিরকের সাথে উপরোক্ত দু'টি শিরকের সম্পর্ক থাকার কারণে কোন কোন মনীষী এটাকে শিরকে আছগারের মধ্যেই গণ্য করেছেন। আর এ চিন্তার আলোকেই শেখ আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মাদ আস-সালমান শিরককে মোট তিন ভাগে বিভক্ত না করে দু'ভাগে বিভক্ত করে শিরকে খাফীকে শিরকে আছগারের মধ্যেই গণ্য করেছেন।[৬৭] এ শিরকটি বক্তার মনের গভীরে গোপন থাকায় তা শিরকে আকবার না আছগারের অন্তর্গত তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

শিরকে আকবারের প্রকারভেদ :

শিরকে আকবার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ এটিকে চার প্রকারে বিভক্ত করেছেন। যেমন,

(১) জ্ঞানগত শিরক (২) পরিচালনাগত শিরক (৩) উপাসনাগত শিরক (৪) অভ্যাসগত শিরক।[৬৮]

১. জ্ঞানগত শিরক :

আমরা যত কিছুই জানি না কেন আমাদের সকলের জ্ঞানের সমষ্টি আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় মহা সমুদ্রের একবিন্দু পানিরও সমতুল্য নয়। কেননা মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান হচ্ছে তার সত্তাগত ব্যাপার, আর আমাদের জ্ঞান হচ্ছে অর্জনগত ব্যাপার। তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করে পঞ্চেন্দ্রিয়, ইলমে যরূরী ও ইস্তেদলালী এর সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করে কিছু জ্ঞানার্জনের তাওফীক্ব দিয়েছেন বলেই আমরা কিছু জানতে পারি। আমাদের অসাক্ষাতে ও পিঠের পিছনে যা কিছু ঘটে, সে সম্পর্কে কেউ সংবাদ না দিলে আমরা কিছুতেই তা জানতে পারি না বলে এ সব আমাদের সম্পূর্ণ অজানা ও অদৃশ্য থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে নবী, রাসূল, অলী ও সাধারণ মানুষ সকলেই সমান।[৬৯]

গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কারো নিকট নেই। এ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য খাছ করে নিয়েছেন। সৃষ্টি জগতের কোন সৃষ্টিকে এ জ্ঞানের অধিকারী করেননি। ভবিষ্যত সম্পর্কে কেউ কোন জ্ঞান রাখে না। এ বিষয়ে সকল জ্ঞান তাঁর নিকটেই রক্ষিত। এক্ষণে কেউ যদি অদৃশ্যের জ্ঞানকে কোন সৃষ্টির দিকে সম্পৃক্ত করে তাহলে তা শিরক হবে। যদি কেউ মনে করেন নবী-রাসূলগণ অথবা অলী, পীর, ফকীরগণ গায়েব তথা অদৃশের জ্ঞান রাখেন তাহলে সেটা হবে জ্ঞানগত শিরক। এরূপ আক্বীদা বা বিশ্বাস মানুষের সৎ আমলগুলোকে ধক্ষংস করে দেয়। অদৃশ্যের জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র। এ মর্মে তিনি বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

'আল্লাহ তা'আলার নিকটেই রয়েছে অদৃশ্যের সকল চাবিকাঠি, তিনি ব্যতীত তা কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু রয়েছে তিনি তা অবগত রয়েছেন। গাছের একটি পাতা পড়লেও তিনি তা জানেন। পৃথিবীর অন্ধকার অংশে কোন শষ্যকণা বা কোন আদ্র বা শুষ্ক বস্তু পতিত হলে তাও প্রকাশ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(আন'আম ৬/৫৯)*।

অত্র আয়াতটি স্পষ্ট প্রমাণ বহণ করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউই গায়ের তথা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না। অদৃশ্যের সকল জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত। এতে কারো কোন অংশ স্থাপনের সুযোগ নেই। অদৃশ্যের জ্ঞান কোন ব্যক্তির নিকট আছে বলে বিশ্বাস করলে তা স্পষ্ট শিরক হিসাবে গণ্য হবে।

২. পরিচালনাগত শিরক :

একজন মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আকাশ-যমীন ও তার মধ্যস্থিত সকল কিছুর রব তথা পরিচালক হলেন আল্লাহ। তিনি বিশ্বজগতের সবকিছুকে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পরিচালনা করছেন। এ জগতের সব কিছুই তাঁর পরিচালনাধীন। তিনি এসবের একচ্ছত্র পরিচালক। এতে অন্য কারো অংশীদার নেই। আর যখন আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকার করব, তখন বুঝতে হবে যে, এ স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে- আমি মহান আল্লাহকে এ জগতের সব কিছুর রব তথা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করার পাশাপাশি এ স্বীকৃতিও প্রদান করছি যে, এ জগত ও তন্মধ্যকার সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক ও পরিচালনাকারী এককভাবে তিনিই। কেননা তিনি তাঁর রূবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ 'তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সব বিষয় পরিচালনা করেন' *(সাজদাহ ৩২/৫)*। তাই একজন মানুষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন সহ সর্বক্ষেত্রে তাঁর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতে বাধ্য। এজন্য তার ধর্মীয় জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন তাঁর দেয়া বিধান তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকারের শিথিলতা প্রদর্শন করার সুযোগ নেই। যেহেতু তিনি বিশ্ব জগতের পরিচালক, সেহেতু তিনি মানব জীবনের উপরোক্ত দিক ও বিভাগ সমূহ পরিচালনা করতে সক্ষম। আর এ সবের পরিচালনা পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে।

৩. উপসনাগত শিরক :

মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক। মানুষের জীবনের প্রতি অপর মানুষ এবং চন্দ্র,

---

৬৫. ড. ইব্রাহীম বরীকান, প্রাগুক্ত পৃঃ ১২৭।
৬৬. মুসনাদে আহমাদ হা/২০১৩৩; আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩০; সনদ ছহীহ।
৬৭. আল-আসইলাতু ওয়াল আজইবাতিল উসূলিয়্যাতি 'আলাল 'আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাতি লি ইবনে তাইমিয়্যাহ, পৃঃ ১৭০-১৭১।
৬৮. শাহ ইসমাঈল শহীদ, তাক্বিয়াতুল ঈমান (দেওবন্দ : মাকতাবা থানভী, ১৯৮৪ খ্রিঃ), পৃঃ ২৯-৫৬।
৬৯. শিরক কী ও কেন? পৃঃ ৭২।

সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আগুন, পানি, পাথর, বৃক্ষ, পশু ও পাখি ইত্যাদির যতবড় অবদানই থাকুক না কেন এরা সবাই মানুষের মতই আল্লাহ্র সৃষ্টি। কোন সৃষ্টি যখন মানুষের স্রষ্টা নয় তখন মানুষের প্রতি সৃষ্টির অবদান বা উপকার যা-ই থাকুক না কেন, কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ্র সমান হতে পারে না। কেননা মানুষের জীবনের প্রতি আল্লাহ তা'আলার যে অবদান রয়েছে এর সাথে অপর কারো অবদানের কোন তুলনা হতে পারে না। মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অবদানের দাবী হচ্ছে, তারা কারো উপাসনা করলে কেবল মাত্র তাঁরই উপসনা করবে। অন্য কারো নয়।[৭০] তিনি তাদের সৃষ্টি করার ফলে তাদের উপর তাঁর যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো- তারা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 'নিশ্চয় বান্দাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অধিকার হলো তারা যেন কেবল আল্লাহ্রই উপাসনা করে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক না করে'।[৭১] যারা আল্লাহ্র অধিকারকে খর্ব করে অন্য কাউকে শরীক করে, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তারা সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে একাকার করে ফেলে। প্রকারান্তরে তারা শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। তাদের এরূপ হীন কর্মের কঠোর সমালোচনা করে মহান আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 'যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কী যারা সৃষ্টি করে না তাদের মতই কী হয়ে গেলেন; এর পরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' *(নাহল ১৬/১৭)*। আল্লাহ যখন মানুষের উপাসনা প্রাপ্তিকেই তাঁর কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যম হিসাবে সাব্যস্ত করে নিয়েছেন, তখন উপাসনার মাধ্যমে অপর কোন সৃষ্টির কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। অন্যথায় তা শিরকে পরিগণিত হবে।

মানুষের কাছে আল্লাহ্র উপাসনার দাবী হলো, মানুষের মুখে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ এবং ভাল-মন্দ সর্বাবস্থায় যেন কেবল আল্লাহ তা'আলার স্মরণই চলতে থাকে। তাঁর কাছেই যেন তারা তাদের অপরাধের জন্য মার্জনা চায়, বিপদে পতিত হলে যেন কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চায়, তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করতে যেন তাঁর উত্তম নামাবলীর মাধ্যমেই তাঁকে আহব্বান করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা অপর কোন অলির নামের মাধ্যমে যেন তাঁকে আহব্বান না করে। কেউ যদি তা না করে বিপদের সময় বা স্বাভাবিক অবস্থায় মুখে ইয়া গাউছ অথবা ইয়া খাজা বলে আব্দুল কাদের জীলানী, মঈনুদ্দীন চিশতী, শাহ জালাল, বায়জিদ বোস্তামীকে স্মরণ করে, তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহব্বান করে, তাহলে সে ব্যক্তি তার মুখের উপাসনায় তাদেরকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করবে।

কোন ব্যক্তি বা স্থানের সম্মানে দাঁড়িয়ে বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করা, কারো সম্মানার্থে মাথা নত ও কদমবুসী করা, সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেজদা করা, কোন মানুষের সন্তুষ্টি বা দেখানোর জন্য ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত দেয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে পশু যবহ ও উৎসর্গ করা, কোন মাযারে মানত পূর্ণ করা বা দান-ছাদাক্বা করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করা ইত্যাদি উপাসনাগত শিরকের অন্তর্গত।

৪. অভ্যাসগত শিরক :

মানব সমাজ চিরাচরিত নিয়মানুসারে কিছু অভ্যাস বা কুসংস্কারের সাথে সম্পৃক্ত; অথচ সেগুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত। দেবতার উদ্দেশ্যে চতুষ্পদ জন্তু উৎসর্গ করা। দেবতাদের জন্য শষ্য ও চতুষ্পদ জন্তুতে অংশ নির্ধারণ করা। সন্তানাদেরকে অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেবতাদের নিকট নিয়ে যাওয়া। তারকার প্রভাবে বৃষ্টি অবতীর্ণ হয় বলে বিশ্বাস করা। জ্যোতিষ, গণক, রাশিচক্র ও কাহিনদের নিকট ভাগ্যের ভাল-মন্দ অবগতির জন্য গমন করা। কোন কোন রোগ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত নিজ থেকে সংক্রমিত হয় বলে বিশ্বাস করা। পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা। কোন কোন দিন ও মাসকে অশুভ মনে করা। কোন কোন দিনে কোন কোন কাজ করা যাবে না বলে বিশ্বাস রাখা। গায়রুল্লাহ্র নামে শপথ করা। শিশুদের গলায় তাবীয ঝুলানো এসবই অভ্যাসগত শিরকের অন্তর্ভুক্ত।[৭২]

আবার কোন কোন বিদ্বান শিরককে অন্য প্রক্রিয়ায় চারভাগে ভাগ করেছেন।[৭৩] যেমন-

১. আশ-শিরক ফিয্যাত :

আল্লাহ্র সত্তার ক্ষেত্রে শিরক। আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন সন্তান নেই। আল্লাহ ব্যতীত আরো ইলাহ বা রব আছে বলে বিশ্বাস করা। আল্লাহ্র সন্তান, বিবি আছে বলে আক্বীদা পোষণ করা আল্লাহ্র সত্তার ক্ষেত্রে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

২. আশ-শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ :

আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে অংশীদার বলে বিশ্বাস করা। আল্লাহ্র কাজে অন্যকে শরীক করা। যেমন সৃষ্টি করা, রিযিক্ব দেয়া, জীবন-মৃত্যু দেয়া, রোগমুক্ত করা, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, মান সম্মান দেয়া, আসমান-যমীন পরিচালনা করা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ্র জন্য বির্ধারিত। এ সমস্ত বিষয়ে অন্য কাউকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা হলো আল্লাহ্র রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক।

৩. আশ-শিরক ফিল উলূহিয়্যাহ :

সর্ব প্রকার ইবাদতে আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করার নাম হচ্ছে আশ-শিরক ফিল উলূহিয়্যাহ। আবার একে আশ-শিরক ফিল ইবাদাহও বলা হয়। এটা হল মূল শিরক। জাহেলী যুগে এ শিরকই অধিক প্রচলিত ছিল। আল্লাহ নবী রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন মূলতঃ তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ্র প্রতি দাওয়াত দেয়া এবং শিরক ফিল ইবাদাহকে নিষেধ করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت.

'আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এজন্য যে, তারা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দিবে এবং সর্ব প্রকার ত্বাগূতকে বর্জন করার নছিহত করবে' *(নাহাল ১৬/৩৬)*।

৪. আশ-শিরক ফিল আসমা ওয়াছ-ছিফাত

এটা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীতে শিরক। আল্লাহ্র নাম দু'প্রকার। সত্তাগত নাম ও গুণবাচক নাম। সত্তাগত নাম হল আল্লাহ। কোন মাখলূক্বের নাম আল্লাহ বা অনুরূপ অর্থে রাখা হলে তা হবে সত্তাগত নামে শিরক। এমনিভাবে আল্লাহ্র নামে মূর্তির নাম রাখা, যেমন ইলাহ থেকে লাত, আযীয থেকে উযযা, মান্নান থেকে মানাত ইত্যাদি নামকরণ করা আল্লাহ্র সত্তাগত নামের সাথে শিরকের অন্তর্ভুক্ত। *(চলবে)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৭০. শিরক কী ও কেন? পৃঃ ১০০-১০১।
৭১. ছহীহ বুখারী হা/২৮৫৬; ছহীহ মুসলিম হা/১৫৩; তিরমিযী হা/২৬৪৩; ইবনে মাজাহ হা/৪২৯৬; আহমাদ হা/১০৮০৮; মিশকাত হা/২৪।
৭২. শিরক কী ও কেন? পৃঃ ১৪৩-১৪৪।
৭৩. প্রফেসর আ ন ম রফীকুর রহমান, আশ-শিরক (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশ, মার্চ ২০১২ ইং), পৃঃ ৪৮।

অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনে ছিয়ামের ভূমিকা

-অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা :

ইসলাম অল্লাহ প্রদত্ত এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে দুনিয়ায় সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠাই এর মৌলিক লক্ষ্য। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা সকল ধর্মের উপর ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

'তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন; যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে' *(ছফ ৬১/৯)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনকালীন আরবের সমাজ ছিল একটি অধঃপতিত সমাজ। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-লুটতরাজ, যেনা-ব্যভিচার, হত্যা-নির্যাতন, ওযনে কম দেয়া, ভেজাল দেয়া, ধোঁকা-প্রতারণা, ওয়াদা খেলাফ, আমানতে-খেয়ানতসহ সকল অনৈতিক ইত্যাদি কাজ চালু ছিল। সে সমাজে দুর্বলের উপর শক্তিমানের যুলুম-নির্যাতন যেন একটি অধিকার হিসাবে পরিগণিত হত। পশুরমত মানুষ হাটে-বাজারে বেচাকেনা হত এবং নারী জাতির অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। এরূপ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই সমাজের নিরাপত্তা বিধানে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রক্রিয়া আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

◈ ইসলাম পূর্ব আরবীয় সমাজের অবস্থা :

আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তৎকালীন সমাজের কোন সমস্যা যেমন মনিবের বিরুদ্ধে দাসকে, ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রদেরকে বা পুরুষের বিরুদ্ধে নারীকে উস্কিয়ে দিয়ে বা অন্য কোন কিছুকে ইস্যু বানিয়ে মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেননি। বরং তিনি আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র অহি-র জ্ঞানের ভিত্তিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে, দুনিয়ার সকল সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব। তাই সকল প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্র কর্তৃত্ব গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন, قُوْلُوْا لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْنَ 'তোমরা বল! আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে'। তাঁর এই ঘোষণায় তৎকালীন সমাজের সত্যনিষ্ঠ ও স্বল্পসংখ্যক মানুষ সাড়া দিয়েছিল। আর সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এটাকে তাদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ মনে করে প্রচ-ভাবে এর বিরোধীতা করে। এই ধারণা করা তাদের অমূলকও ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ডেকে এনে বলেছিলেন, 'তোমরা যদি এ দ্বীন গ্রহণ কর তাহলে গোটা আরবের কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে আসবে এবং সমগ্র অনারব তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে'।

তাছাড়া আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিকটে দ্বীনের বিজয়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। নিপীড়ন-নির্যাতনে জর্জরিত সাথীরা যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে? তখন তিনি জবাবে বলেন, সেদিন খুবই নিকটে যেদিন একজন ষোড়শী যুবতী স্বর্ণালংকারসহ মীনা থেকে হাযরামাউত একাকী হেঁটে যাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না'। তাই আরবের কাফের মুশরিকরা বুঝে শুনেই রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও শারীরিক নির্যাতন সহ বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ .

'আমি জানি এরা যে সব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে আপনার বড়ই মনোকষ্ট হয়। কিন্তু এরা কেবল আপনাকেই অমান্য করে না; বরং যালেমরা আল্লাহ্র বাণী ও নিদর্শন সমূহকেই মানতে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*।

◈ অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের নীতিমালা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৩ বছরের ব্যবধানে এমন সোনালী ও অপরাধমুক্ত সমাজ উপহার দিলেন যে মেডিসিনের মাধ্যমে, সে মেডিসিন আজও মওজুদ রয়েছে। সেটি হল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। তাহলে কেন আজ সমাজের পরিস্থিতি এত করুণ? যা মহানবী (ছাঃ)-এর নবুওয়াতের পূর্ব সময় তথা জাহেলিয়াতকে হার মানিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদর্শ দ্বারা সকল অন্যায়ের জবাব দিয়েছেন। কখনও তিনি সন্ত্রাসের জবাব সন্ত্রাস দিয়ে দেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

'তোমরা অন্যায়কে দূর কর সেই ভাল দ্বারা, যা অতীব উত্তম, তাহলে দেখবে তোমার জানের দুশমনরা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে' *(হা-মীম সেজদা ৪১/৩৪)*।

◈ অপরাধের প্রকৃতি :

৫৫ হাযার বর্গ মাইলের দেশ বাংলাদেশ। এখানে প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম বসবাস করে। এদেশের প্রত্যেকটি সেক্টরে যে পরিমাণ অপরাধ চলছে তা লিখতেই লজ্জা করে। মিডিয়ার সৌজন্যে বিশ্বব্যাপী সংঘঠিত অপরাধের পরিধি জানা যায়। অন্যদিকে জানা যায় ধর্মীয় ক্ষেত্রে কী পরিমাণ অপরাধ চলছে? আর এই অপরাধ রোধ করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপারেশন ক্লীন হার্ট, র‍্যাব বাহিনী, যরূরী অবস্থা জারী ইত্যাদির মাধ্যমে শুধুমাত্র সাময়িকভাবে অপরাধীদের মনে ভীতির সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। কার্যতঃ কোনই ফল হয় না। কারণ মানুষকে মানুষের ভয় দেখিয়ে, আইনের ভয় দেখিয়ে কিংবা শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব নয়। অপরাধ হ্রাস পাবে তখনই যখন আইন প্রয়োগকারী এবং অপরাধী মানুষগুলো সবাই একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে। আর আল্লাহভীতি অর্জনের সর্বোত্তম পন্থা হল রামাযানের ছিয়াম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর; যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

অপরাধমুক্ত সমাজ : ছিয়ামের ভূমিকা

আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টির ব্যাপারে ছিয়াম তুলনাহীন। ছিয়ামের উদ্দেশ্যই হল মানুষের মধ্যে তাক্বওয়ার গুণ সৃষ্টি করা। সকল ইবাদতের মধ্যে লৌকিকতার প্রদর্শনী আছে। যেমন- ছালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা এবং হজ্জ সম্পাদন করা প্রভৃতি। কিন্তু ছিয়াম এ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ছিয়াম পালনকারী সকলের সাথে সাহরী ও ইফতার করে ঠিকই; কিন্তু সারাদিন পানাহার বর্জন করে থাকে একান্ত আল্লাহ্র ভয়ে। পিপাসায় ছটফট করলেও ছিয়াম পালনকারী লোকচক্ষুর আড়ালে এক ফোঁটা পানি গ্রহণ করে না কিংবা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হলেও নিভৃতে আহার করে না। যা শুধুমাত্র আল্লাহ্র ভয়েই হয়ে থাকে। তাই হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, الصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ 'ছিয়াম একমাত্র আমার জন্যই, আর আমি নিজেই তার প্রতিফল দান করিব (যত ইচ্ছা তত দিব)' *(বুখারী হা/৭৪৯২)*।

♦ প্রশিক্ষণের মাস রামাযান :

একদিন-দু'দিন নয় দীর্ঘ মেয়াদী টানা একটি মাসের এই প্রশিক্ষণে মানুষ আল্লাহ্র আইন পালনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রামাযান মাসে আল্লাহ পাকের নিষেধাজ্ঞার ফলে হালাল জিনিস গ্রহণ থেকে সে সাময়িকভাবে বিরত থাকে। তাই তার পক্ষে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ জিনিস গ্রহণের তো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু দূর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, শতকরা নবক্ষই ভাগ মুসলিমের এ দেশে মসজিদে মুছল্লী পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং রামাযান মাসে হোটেল রেস্তোরা বন্ধ রেখে বিপুল পরিমাণ মানুষ ছিয়াম পালন করলেও আমাদের চরিত্রের কোন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না। ছিয়াম সাধনার পরও যদি অসৎ প্রবৃত্তিকে আমরা পরিহার করতে না পারি তবে সে ছিয়াম হবে অর্থহীন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِى أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং অনুরূপ কার্যকলাপ পরিত্যাগ করতে পারল না, তার পানাহার পরিত্যাগ করার মধ্যে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী হা/১৯০৩; মিশকাত হা/১৯৯৯)*।

ছিয়াম মানুষকে অন্যায় পথ থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করে এবং ছিয়ামের মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হয়ে নতুন জীবন শুরু করার অনুপ্রেরণা যোগায়। আমরা রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে লক্ষ্য করে থাকি, সরকার তার বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষ বাহিনী, দক্ষ কর্মকর্তা তৈরীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আনছার বাহিনী, র‍্যাব বাহিনী, বর্ডারগার্ড বাহিনী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, শিক্ষক, লোক প্রশাসন বিভাগের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। উল্লেখিত বাহিনীগুলোকে আত্মসংযমী, তাক্বওয়াবান ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছিয়ামের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা দরকার। যা সরকারীভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

♦ আত্মশুদ্ধির অফুরন্ত সুযোগ :

রামাযান আত্মশুদ্ধির এক অপূর্ব সুযোগ নিয়ে আগমন করে। মানুষ আজন্ম পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকবে আর আল্লাহ মজা করে তাকে জাহান্নামে পোড়াবেন এটি তাঁর অভিপ্রায় নয়। বরং তিনি চান তাঁর আদরের বান্দা ভুল পথ পরিহার করে আবার ফিরে আসুক। মশগূল হোক তাঁর ইবাদতে। রামাযানের ছিয়াম সেই অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করবে তার পূর্বের যাবতীয় (ছগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রিতে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করবে তার পূর্বের যাবতীয় (ছগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রিতে ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বের যাবতীয় (ছগীরা) গোনাহ ক্ষমা করা হবে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮)*।

♦ কুরআন নাযিলের মাস :

রামাযান মাস এমন গুরুত্বপূর্ণ মাস, যে মাসে বিশ্ব মানবতার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

'রামাযান মাসই হল সেই মাস, যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে যেন ছিয়াম পালন করে' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। পবিত্র রামাযান মাস কুরআন নাযিলের মাস ও কুরআন বিজয়ের মাস। কুরআন মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত। আর ছিয়ামের মাধ্যমে গড়ে উঠা মুত্তাক্বী বান্দাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা অহি-র বিধান তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধ দূর করা।

♦ ছিয়ামের মৌলিক শিক্ষা :

ছিয়াম সাধনার ফলে মানুষের মনের কালিমা দূর হয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সর্বত্র একটি পবিত্র মন এবং মানসিকতার বিকাশ ঘটে। 'The Clinical History of Islam' গ্রন্থে যথার্থ বলা হয়েছে যে,

'The Fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellent teaching for building a good moral character'.

অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ছিয়ামের রয়েছে এক অভাবনীয় ক্ষমতা এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে চমৎকার অবদান। তাছাড়া ছিয়াম মানুষের জ্ঞানের ভান্ডারও বাড়িয়ে দেয়'। কারণ 'Empty stomach is the power house of knowledge'. অর্থাৎ 'ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের ভান্ডার'।

Contents

ছিয়াম আমাদেরকে আত্মসংযম শিক্ষা দেয়। ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম। মানুষের জৈবিক চাহিদা ইসলাম অস্বীকার করে না; বরং সমাজের কল্যাণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ইসলাম মানুষের পক্ষে যা সম্ভব কেবলমাত্র তাই নির্দেশ করে। আল্লাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। ছিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে পরবর্তী সময়ে আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যদিকে ইফতারে বিলম্ব না করার তাগিদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ 'মানুষ ততদিন কল্যাণের সাথে থাকবে যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(মুত্তাফক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৪)*। এতে বুঝা যায়, মানুষকে কষ্ট দেয়া নয়; বরং আল্লাহ্র আইন পালনে অভ্যস্থ করাই ছিয়ামের উদ্দেশ্য, যাতে করে সে পরবর্তী **১১**টি মাস যথাযথভাবে আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলতে পারে।

♦ করুণ বাস্তবতা :

আজ আমাদের সমাজে অপরাধ প্রবণতা অধিকহারে বেড়েছে। বিশ্ব মানচিত্রে আমরা দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছি। একটি আত্মবিশ্বাসী জাতি হিসাবে এটা আমদের জন্য বড়ই লজ্জার। অথচ ইসলাম সকল প্রকার অপরাধের উৎস নির্মূল করতে চায়। দুর্নীতি, অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত সবই ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। ওযনে কম, ভেজাল দেয়া, কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি ঘটান, ঘুষ ও সূদের আদান-প্রদান, ধোঁকা-প্রতারণা, অপহরণ, গুম, খুন, প্রতিশ্রুতির খেলাফ, আমানতে খিয়ানত, সরকারী দায়িত্বপালনে অবহেলা, মালিকের কাজ-কর্মে গাফেলতি প্রদর্শন, আক্বীদা-বিশ্বাস, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ, তালাক্ব, দাওয়াত ও জিহাদ ইত্যাদিতে দুর্নীতি নামক অপরাধ সমাজকে বিষময় করে তুলেছে। এ সবই কাবীরা গুনাহ, যার পরিণতি জাহান্নাম। রামাযানের ছিয়াম আমাদের মধ্যে এ অনুভূতিই সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ পাক গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থা জানেন আর এই উপলব্ধি থেকে আল্লাহ পাকের নাফরমানিমূলক সকল কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকাই ছিয়ামের মত দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের মৌলিক উদ্দেশ্য।

করণীয়

১. শিরক, বিদ'আত ও রিয়ামুক্ত ছহীহ হাদীছে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে সার্বিক ইবাদত সম্পন্ন করা।

২. রামাযানে ফরয ইবাদত সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের সাথে সাথে নফল ছালাত ও বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা। আর এ অভ্যাস রামাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে (তাহাজ্জুদ, নফল ছিয়াম, নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত) চালু রাখার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া। কেননা ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে সুপারিশ করবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ.

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছিয়াম ও কুরআন (ক্বিয়ামতের দিন) বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি হতে বাধা প্রদান করেছি; সুতরাং তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রিকালে নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি; সুতরাং তার পক্ষে আমার সুপারিশ কবুল করুন। তখন তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/১৯৬৩, সনদ ছহীহ)*।

৩. **দৃষ্টিকে সংযত রাখা :** যে সব বস্তু মানব হৃদয়কে আল্লাহ্র স্মরণবিমুখ করে দেয় কিংবা যে দিকে তাকাতে শারঈ নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে, সেদিক থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা। যেমন ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে পরনারী, টেলিভিশন কিংবা সিডি-ভিডিও, ছায়াছবির অশ্লীল দৃশ্যাবলী কিংবা দেয়াল পোস্টারের অশালীন ছবি ইত্যাদি।

মূলতঃ অসংযত দৃষ্টির কুপ্রভাব শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মন-মানসিকতাকেই কলুষিত করে না; বরং তা তার গোটা দেহের সমস্ত কর্মকা- সংক্রমিত হয়। যা এক সময় ক্রমান্বয়ে ব্যক্তি পর্যায় অতিক্রম করে ভয়ংকর বিপদ নিয়ে জাতীয় অস্তিত্ব বিনাশী অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়ায়। আকাশ-সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য থেকে আসা অশ্লীল ছবির কুপ্রভাবে আমাদের যুব সমাজের মধ্যে বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়ের যে ধস নেমেছে, তা এই নির্মম সত্যেরই রূঢ় বাস্তবতা। এই অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস রোধ করতে যদি আমরা অক্ষমতার পরিচয় দিই, তাহলে আগামী দিনে ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের জাতীয় স্বকীয়তা সংরক্ষণ করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্ব প্রকার অশ্লীলতার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'আর তোমরা নির্লজ্জতা-অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য' *(আন'আম ৬/৫১)*।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মিডিয়া জগতে যে বিপস্নব সাধিত হয়েছে, সে সত্যকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আমরা এখন এই মিডিয়ার অক্টোপাসে জড়িয়ে পড়েছি। টেলিভিশন নেই এমন বাসা-বাড়ী এখন খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই আমাদেরকে আজ ইসলামী মিডিয়া প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প ধারা সৃষ্টি করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধ সম্পন্ন জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মিডিয়াকে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। আর এটিকে ইসলামী জীবনাদর্শ প্রচারের একটি অন্যতম মোক্ষম উপায় হিসাবে কাজে লাগাতে হবে।

ফলে মিডিয়া জগতকে ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী নির্মাতাদের পদচারনায় মুখরিত করে তুলতে হবে, যা সময়ের শ্রেষ্ঠ দাবী। অন্যথায় এ মিডিয়া জগতকে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও তাদের দোসর ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিরাই সর্বদা একচ্ছত্রভাবে দখল করে রাখবে। প্রচার করবে মানব সভ্যতা বিধ্বংসী বিষাক্ত অস্ত্র আর ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য। তাই আসুন এই রামাযানে আমরা শিক্ষাঙ্গন, শিল্পাঙ্গন, কর্মাঙ্গন তথা জীবনের সর্বস্তর থেকে অশ্লীলতা ও নিলর্জ্জতার মূলোৎপাটনে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কিংবা সাংগঠনিকভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে এগিয়ে যায়।

৪. এক মাস ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে নেশাকর সকল প্রকার মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করা। সমাজে নেশাগ্রস্থ অনেক লোকই ছিয়াম পালন করে। সুবহে ছাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কঠিন কষ্ট

শিকার করে ছিয়াম পালন করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্ধেকের বেশী সময় মাদকদ্রব্য পরিহার করে থাকে। কিন্তু ইফতারের পর আবার নেশায় মত্ত হয়। রামাযানের শিক্ষা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে বাকী সময়ে ও বাকী অংশে এমন জঘন্য হারাম কাজ পরিত্যাগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ 'যে বস্তু অধিক পরিমাণে সেবন করলে নেশা সৃষ্টি করে তার কিঞ্চিৎ পরিমাণও হারাম' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৮১; মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ হাসান ছহীহ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই মদ, আর প্রত্যেক নেশাকর বস্তুই হারাম' *(মুসলিম হা/৫৩৩৬; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*।

৫. বেশী বেশী ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা। ইসলামী সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে কোন্টি তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত, ইত্তেবা ও তাক্বলীদ, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, ইসলামী অর্থনীতি ও সূদ ভিত্তিক অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি ও প্রচলিত স্বার্থদ্বন্দ্ব রাজনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায়।

৬. অধিকহারে ছাদাক্বা করা এবং ছাদাক্বা আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা। ইসলামী আন্দোলনের আর্থিক বিষয়টি বেশী নির্ভর করে বায়তুলমাল তথা যাকাত, ফিৎরা, ওশর, কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয়লব্ধ টাকা ইত্যাদির উপর। বিশেষ করে যাদের উপর যাকাত ফরয হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই হিসাব করে ২.৫০% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

৭. বাতিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং জিহাদী চেতনা নবায়ন করা : ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন করা যায়। আর এর মাধ্যমে সমাজে অন্যায়ের যে ব্যাপকতা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আবশ্যক। কেননা বর্তমান মুসলিম সমাজ ঘুনে ধরা এক বিশৃঙ্খলাযুক্ত সমাজে পরিণত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দু'টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয় সংঘটিত হয় এ রামাযান মাসেই। তাই বলা যায়, রামাযান হল আল্লাহদ্রোহী ত্বাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাস। আত্মশুদ্ধির মাস। দ্বীন বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার মাস। হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারীর মাস। অতএব দুনিয়ার বিপদগ্রস্থ মুসলিম জাতির লাঞ্ছনা, বঞ্চনা এবং নিস্তেজ অস্তিত্বের গস্নানি দূর করতে রামাযান মাসে ছিয়াম সাধনা করে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। আল্লাহদ্রোহী ত্বাগূতী শক্তির সকল অপকৌশল, কূটজাল আর চক্রান্তের বেড়াজাল ছিন্ন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ী সিদ্ধান্তও নিতে হবে এ রামাযানের অর্জন থেকেই।

৮. রামাযান থেকে শিক্ষা নিয়ে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করা ও জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন করা এবং জামা'আত বা সংগঠনের মুজবূতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'আর তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। হারেছ আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِه إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ–

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি। (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তার আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হতে ইসলামের গন্ডী ছিন্ন হল যতক্ষন না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহব্বান জানাল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪, সনদ ছহীহ)*।

৯. সময়ের সদ্ব্যবহার : রামাযানের ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে সময়ের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। রামাযানের একমাস প্রশিক্ষণে সময়ানুবর্তিতার যে চর্চা হয় তা পরবর্তী মাসে প্রতিফলিত করতে হবে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, তারাবীহ্র ছালাত, সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা, সাহারীর আযানের পর সাহরী খাওয়া ও ছুবহে ছাদিকের পর সাহরী খাওয়া বন্ধ করা ইত্যাদি লক্ষ্যণীয়।

মহান আল্লাহ বলেন, وَالْعَصْرِ– إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ 'কালের শপথ। নিশ্চয় সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত' *(আছর ১০৩/১-২)*। সুতরাং সময় আল্লাহ প্রদত্ত এক মহা মূল্যবান নে'মত, যা ক্বিয়ামতের দিন মানুষের যাবতীয় কৃতকর্মের সাক্ষ্য বহন করবে। এজন্য মাহে রামাযানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এর সর্বোত্তম ব্যবহারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হবে। অতিক্রান্ত সময় আর কখনও কোনদিন ফিরে আসবে না। রামাযান মাসের ছিয়াম যেটা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে সেটা আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সময়ের গুরুত্ব বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ 'দু'টি নে'মতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ উদাসীন- স্বাস্থ্য ও অবসর সময়' *(বুখারী হা/৬৪১২, মিশকাত হা/৫১৫৫)*। অতঃএব সময়ের যথাযথ ব্যবহার প্রত্যেক মু'মিনের একান্ত কর্তব্য।

১০. রামাযানে বেশী বেশী দ্বীনি দায়িত্ব পালন করা। পাগল ও অবুঝ শিশু ব্যতীত কেউ দায়িত্বের বাহিরে নয়; বরং প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। ছিয়ামের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাকী ১১টি মাসেও অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পালন করা একজন কর্মীর দায়িত্বশীলতার পরিচয়। যে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে সে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যায়। যে দায়িত্ব পালনে অলসতা করে যে সফলতার আলো দেখতে পারে না; বরং সে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয় এবং সংগঠনের ও জাতির জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

দায়িত্ব পালন সম্পর্কে উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আযীয (রহঃ)-এর অনুভূতি অত্যন্ত স্বরণীয়। তিনি কুরআন ও হাদীছের নির্দেশানুসারে শাসন পরিচালনা করতেন। শারঈ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। ধনী-দরিদ্র, আরব-অনারব সকলেই তাঁর নিকট সমান ছিল। দুঃখী ও গরীবদের তিনি প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। তাদের চিন্তায় খলীফা প্রায়ই অস্থির থাকতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী তাকে ছালাতের পর ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। স্ত্রী ইহার কারণ জানতে চাইলে খলীফা জবাব দিলেন, 'হে ফাতিমা! আমি মুসলিম ও অপরিচিতদের উপর শাসক নিযুক্ত হয়েছি। যে দরিদ্র ব্যক্তিগণ অনশনগ্রস্থ, যে রুগ্ন ব্যক্তি

অসহায়, যে সমস্ত বস্ত্রহীন লোক দুর্দশাগ্রস্থ, যে অত্যচারিতগণ নিষ্পেষিত, যে অপরিচিত লোক কারারুদ্ধ এবং সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যাদের বৃহৎ পরিবার আছে অথচ আয় কম; আমি তাদের সকলের বিষয় এবং সকল দেশে ও দূরবর্তী প্রদেশ সমূহে অবস্থিত এই রকম অনেকের বিষয় চিন্তা করছিলাম; আমি মনে করলাম যে, আমার প্রভু শেষ বিচারের দিন তাদের সম্বন্ধে আমার নিকট হিসাব চাইবেন। আমার ভয় হল যে, সেখানে কোন প্রকার আত্মরক্ষাই কাজে আসবে না। তাই আমি ক্রন্দন করছিলাম' *(অধ্যাপক কে. অলী, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৭)*।

অতএব হে দায়িত্বশীল ইমাম, মুয়াযিযন, খাদেম ও কমিটির সদস্যবৃন্দ! মাহে রামাযান থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বীনের যথাযথ দায়িত্ব পালন করুন। আল্লাহ তাওফীক্ব দিন-আমীন!

১১. নেতার প্রতি আনুগত্য :

রামাযানে ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে নেতার প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কেননা একমাস ছিয়াম সাধনার পাশাপাশি সর্বাধিক ছালাত এ মাসে আদায় করা হয়। মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করে। ইমামের অনুসরণ না করলে ছালাত হয় না। অতএব শুধু ছালাতের ক্ষেত্রে নয়; বরং সর্বক্ষেত্রে ইমাম বা প্রতিনিধির আনুগত্য করা অপরিহার্য। আর নেতৃত্ব-আনুগত্য বা নেতা-কর্মীর সম্পর্ক হল একটি দেহে চলমান রক্তের ন্যায়। রক্ত ছাড়া যেমন দেহের কোন মূল্য নেই অনুরূপ দেহহীন রক্তও অর্থহীন। আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, অতঃপর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার নেতার আনুগত্য কর। যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে বিষয়টিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৪/৫৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর নেতার কথা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা আবশ্যক, চাই তা কারো পসন্দে হোক বা অপসন্দ হোক। যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আল্লাহ্‌র নাফরমানীর আদেশ দেন। আল্লাহ্‌র নাফরমানীর আদেশ দেওয়া হলে তা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার অবকাশ নেই' *(মুসলিম হা/৪৮৬৯; নাসাঈ হা/৪২০৬)*। অতএব রামাযানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতা-কর্মীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং দ্বীনের কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া একান্ত যরূরী।

১২. তাক্বওয়াই মূল্যায়নের মাপকাটি

পৃথিবীতে বহু বংশ, বহু দল, অসংখ্য পরিবার, অসংখ্য দেশ, সাদা-কালো নানা বর্ণের মানুষ বসবাস করে। কিন্তু ইসলামে কালোর উপর সাদার এবং গরিবের উপর ধনীর কোন প্রাধ্যান্য নেই। মানুষ বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার চেষ্টা করে থাকে। ছিয়াম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ইবাদত। কেননা এটি রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, কালো-সাদা, ছোট-বড় সবার জন্য একই সময় নির্ধারণ করেছে। আর ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে মূলতঃ আল্লাহভীতিই অর্জিত হয়। আর এটিই মূল্যায়নের মাপকাটি। যে যতবেশী তাক্বওয়াশীল সে ততবেশী আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত ও প্রিয়পাত্র। আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছে সেই সর্বাধিক সম্মানী, যে আল্লাহ্‌কে সর্বাধিক ভয় করে' *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' *(আর-রহমান ৫৫/৪৬)*।

১৩. অভাবীদের প্রতি দৃষ্টি :

রামাযানের ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে একটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি নযর দেওয়া ধনিক শ্রেণীর মানুষের একান্ত কর্তব্য। সেটা হল অভাবী মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা। অসংখ্য হতদরিদ্র মানুষ, যারা দিনে একবার খেতে পারে না। ক্ষুধার যন্ত্রনায় ছটফট করে। ক্ষুধার তীব্রতা ধনিক শ্রেণীর মানুষ যাতে উপলব্ধি করে এবং অভাবী মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এটিই ছিয়ামের মৌলিক শিক্ষার অন্যতম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক মুসত্বফা লুৎফী আল-মানফালুতী তার الغني والفقير প্রবন্ধে বলেন, আকাশ কখনও বৃষ্টিদানে কৃপণতা করেনি, ভূমি তার ফসলদানে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সক্ষম ব্যক্তি দুর্বলকে; আর ধনী দরিদ্রকে হিংসা করছে। মানব সন্তানের মধ্যে শক্তিমানেরা বড় যালিম। কেননা তাদের কেউ ঘুমায় সুন্দর অট্টালিকায়, আবার কেউ ঘুমায় ফুটপাতে। ধনীরা দীর্ঘ জীবন লাভের প্রত্যাশায় নিজেদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং গরীবের অংশকে গ্রাস করার প্রয়াস চালিয়েছে। ফলে তাকে অতিভোজন দ্বারা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে'। সাহিত্যিকের ভাষায়, بطنة الغني انتقام لجوع الفقير 'ধনীরা অতি ভোজন জনিত পীড়া গরীবের ক্ষুধার প্রতিশোধ'।

১৪. রামাযানে ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করতে হবে। দীর্ঘ একমাস ছিয়াম সাধনা, একই সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত সহ তারাবীহ্‌র ছালাত কাতারভুক্ত হয়ে পড়ার মাধ্যমে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন তৈরী করে সেটাকে বাকী ১১টি মাসে অটুট রাখা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মিমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*।

উপসংহার :

ছিয়াম প্রতি বছরের মত এবারো আমাদের মাঝে হাজির হচ্ছে। আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহ যে আমাদের ত্রম্নটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে নতুনভাবে জীবন-যাপনের সুযোগ তিনি তার বান্দাদেরকে দান করতে চান। তাই আসুন কোন চালাকীর আশ্রয় না নিয়ে রামাযানের প্রত্যেকটি ছিয়াম যথাযথ নিয়ম পদ্ধতিতে সম্পন্ন করি। লায়লাতুল ক্বদরের পবিত্র ও মহিমান্বিত রজনীতে নফল ছালাত এবং অধিকহারে কুরআন তেলাওয়াত করি। নিজের ত্রম্নটি-বিচ্যুতির জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে পরিপূর্ণভাবে তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধানের কাছে সমার্পন করি। মুসলিম হিসাবে ইসলামে বিশ্বাস, ইসলাম অনুসরণ এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান ছাড়া পরকালে মুক্তির কোন পথ খোলা নেই। তাই এই সত্য উপলব্ধি করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকল প্রকার অপরাধ থেকে ফিরে আমাদেরকে আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তার পথে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসার সুযোগ করে দিন এই হোক এবারের ছিয়ামে আমাদের প্রার্থনা। হে আল্লাহ! আমাদের কবুল করুন-আমীন!!

[লেখক : প্রভাষক, আরবী বিভাগ, আল-হেরা মহিলা কলেজ, যশোর; সাধারাণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, যশোর সাংগঠনিক যেলা]

শরী'আতের নামে মন্দ চর্চা : প্রসঙ্গ শবেবরাত

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

প্রাক-কথা :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মহানবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তা পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল। তাই এতে নতুন কিছু সংযোজন বা বিয়োজনের সুযোগ নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন মনোনীত করলাম' *(মায়েদা ৫/৩)*। তিনি আরো বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের অনুসরণ কর না; নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীনের মধ্যে যাবতীয় নবোদ্ভূত বস্তুই প্রত্যাখ্যাত'।[৭৪] অন্যত্র তিনি বলেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম হচ্ছে শরী'আতের মধ্যে নতুন বস্তুর উদ্ভব ঘটান। কেননা (ধর্মের নামে) প্রতিটি নবোদ্ভূত বস্তুই হল ভ্রষ্টতা'।[৭৫]

বিদ'আতের ব্যাপারে ইসলামে এ ধরনের কঠিন সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও একশ্রেণীর তথাকথিত আলেম সমাজ তাদের অল্পবিদ্যাকে পুঁজি করে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ'আতের বীজ বপন করে চলেছেন। এ ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলেও আশানুরূপ কোন সাড়া পাওয়া যায় না। তারা বলে, 'আমরা কী শরী'আত কিছুই বুঝি না! তোমাদেরকেই শুধু শরী'আত বুঝার এজেন্ডা দেওয়া হয়েছে'?। সমাজের সাধারণ মানুষদেরও একই অবস্থা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় শরী'আত যেন বড় বিপাকে! সবাই যার যার মত করে শরী'আত বুঝতে চায়। শরী'আতের নামে মন্দ চর্চার মহড়া চলছে। এর মধ্যে একটি হল- মধ্য শা'বানের 'শবেবরাত'। যা এক শ্রেণীর আলেম সমাজ শরী'আতের নামে উদ্‌যাপন করছেন। অথচ এটি সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী।

শা'বান মাসের ফযীলত :

ইসলামী শরী'আতে শা'বান মাসের বিশেষ ফযীলত রয়েছে, এতে কোন দ্বিমত নেই। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ. 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন।[৭৬]

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ 'আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে একাধারে দু'মাস ছিয়াম পালন করতে দেখিনি শুধু শাওয়াল ও রামাযান মাস ছাড়া।[৭৭]

শবেবরাত-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ :

শবেবরাত শব্দটি যৌগিক। একটি 'শব' অন্যটি 'বরাত'। শব শব্দটি ফার্সী ভাষা থেকে গৃহীত, যার অর্থ রাত বা রজনী। আর বরাত শব্দটি আরবী ভাষা থেকে গৃহীত, যার অর্থ বিমুক্তি, সম্পর্কহীনতা, মুক্ত হওয়া, নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশে 'বরাত' শব্দটিকে 'ভাগ্য' বা 'সৌভাগ্য' অর্থে ব্যবহার করা হয়, যা ঠিক নয়। অন্যদিকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোথাও 'শবেবরাত' বা 'লাইলাতুল বারাআত' পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়নি। ছাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগেও এ শব্দের প্রচলন দেখা যায় না।

শবেবরাত-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর স্বর্ণযুগ এবং পরবর্তী চার শতাব্দী পর্যন্ত শবেবরাত বা লায়লাতুল বারাআত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। পরবর্তীতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে কতিপয় বিদ্বানকে নিছফে শা'বানের পরিবর্তে লায়লাতুল বারাআত শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। আর এরও বহু পরে গত কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকে মধ্য শা'বানের ফযীলত সংক্রান্ত কিছু যঈফ ও জাল হাদীছকে পুঁজি করে উপমহাদেশের বাজারে 'শবেবরাত' নামে হুজুরদের পকেট গরম ও পেট পূজার রমরমা ব্যবসা চালু হয়। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণও 'ভাল কাজ' (?) মনে করে ধোঁকায় পড়ে যায়। এভাবে একশ্রেণী পেট পূজারি হুজুর এবং ভ্রষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের পৃষ্ঠপোষকতায় পৃথিবীর সর্বত্র এই বিদ'আত খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ।

সর্বপ্রথম ৪৪৮ হিজরীতে জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে মধ্য শা'বানের রজনীতে 'ছালাতুল আলফিয়া' নামে নতুন একটি ইবাদত চালু হয়। যা কতিপয় অতি আবেগী আলেম কর্তৃক চালু হয়। এ ছালাতের প্রতি তৎকালীন সাধারণ জনগণের ব্যাপক আগ্রহ ছিল। এর জন্য ব্যাপক আলোকসজ্জাও গ্রহণ করা হত। এ ছালাতের সাথে বৈশিষ্ট্য বহির্ভূত অনেক পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন প্রকাশ পেতে থাকে। এমনকি নেক্কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র গযবের ভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।[৭৮]

শবেবরাত-এর পক্ষে প্রচলিত দলীল ও তার পর্যালোচনা

কুরআন থেকে দলীল :

প্রচলিত শবেবরাত-কে যায়েয করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীছ থেকে বেশ কিছু দলীল পেশ করতে দেখা যায়, যা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা মরীচিকার মাঝে পানি খোঁজার মত প-শ্রম মাত্র। আমরা এখানে তাদের দলীলগুলো উল্লেখ করতঃ তার পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথমতঃ শবেবরাতের স্বপক্ষে পেশকৃত দু'টি আয়াত,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ- فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ .

৭৪. বুখারী হা/২৬৯৭।
৭৫. شَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ -মুসলিম হা/২০৪২।
৭৬. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/২৭৭৭; মিশকাত হা/২০৩৬।
৭৭. তিরমিযী, হা/৭৩৬; মিশকাত হা/১৯৭৬, ছহীহ তারগীব হা/১০২৫, সনদ ছহীহ।
৭৮. মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ (দেওবন্দ : আশরাফী ছাপা, তাবি) ৩/৩৫০ পৃঃ।

'আমি একে (কুরআন) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী'। 'এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৪৪/৩-৪)*।

পর্যালোচনা :

উপরিউক্ত আয়াতে لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ বা 'বরকতময় রজনী'-এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ছাহাবী ও তাবেঈ বিদ্বানগণ বলেছেন, এ রাতটি হল 'লাইলাতুল ক্বদর'।[৭৯] এর বিপরীতে বিশিষ্ট তাবেঈ ইকরামা বলেছেন, এ আয়াতে 'বরকতময় রাত্রি' বলতে মধ্য শা'বানের রাত বা 'শবেবরাত'-কে বুঝানো হয়েছে।[৮০] কিন্তু প্রসিদ্ধ মুফাসসিরদের মধ্যে কেউ-ই ইকরামার এ মতকে গ্রহণ করেননি। তারা সকলেই এ মতটিকে বাতিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং অন্যান্য ছাহাবী-তাবেঈর মতটিই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। যেমন

(১) ইবনু কাছীর (৭০০-৭৭৪ হিঃ) বলেন,

من قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النُّجْعَة فإن نص القرآن أنها في رمضان.

'ইকরামার ন্যায় যারা বলবে, বরকতময় রাত্রিটি 'নিছফে শা'বান' বা শা'বানের মধ্যম রজনী। আমি বলব, ইহা একটি অসম্ভব ও অবাস্তব মত। কারণ কুরআনে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, এ রাত্রিটি রামাযানের মধ্যেই'।[৮১]

(২) ইমাম জারীর আত-তাবারী (রহঃ) বলেন,

والصواب من القول في ذالك قول من قال عني بها ليلة القدر.

'সঠিক মত হল তাদের মত যারা বলেন, লাইলাতুল মুবারকা হল লাইলাতুল ক্বদর'।[৮২]

(৩) ইবনুল আরাবী (মৃত ৫৪৩ হিঃ) বলেন,

جمهور العلماء علي أنها ليلة القدر منهم من قال إنها ليلة النصف من شعبان و هو باطل...

'অধিকাংশ আলেম বলেছেন যে, লাইলাতুল মুবারকা হল লাইলাতুল ক্বদর। কেউ কেউ বলেছেন, তা হল মধ্য শা'বানের রজনী, যা বাতিল'।[৮৩]

(৪) আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন,

والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان لأن الله سبحانه أجملها هنا وبينها في سورة البقرة بقوله شَهْرُ رَمَضَانَ الذى أُنزِلَ فِيهِ القرآن .

'প্রকৃতপক্ষে লাইলাতুল মুবারকা দ্বারা এখানে লাইলাতুল ক্বদর উদ্দেশ্য, নিছফে শা'বান নয়, যা অধিকাংশ আলেমের অভিমত। কেননা আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে করলেও, সূরা বাক্বারায় তাঁর বাণী, (شَهْرُ رَمَضَانَ الذى أُنزِلَ فِيهِ القرآن) দ্বারা তা স্পষ্ট করেছেন'।[৮৪]

(৫) তাফসীরে ইবনে আবক্ষাসে এসেছে, فيها الرحمة و المغفرة والبركة و هي ليلة القدر... 'রহমত, মাগফেরাত ও বরকতময়-তি এ রজনী হল লাইলাতুল ক্বদর'।[৮৫]

(৬) মুফতী মুহাম্মদ শফী বলেন, কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'বরকতময় রাত্রির' অর্থ নিয়েছেন 'শবেবরাত'। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা এখানে সর্বাগ্রে কুরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআন অবতরণ যে রামাযান মাসে হয়েছে, তা কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত'।[৮৬]

এ ছাড়াও ইমাম কুরতুবী, সাইয়েদ মাহমুদ আলূসী, আশরাফ আলী থানবী, মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ওলামায়ে কেরামাও লাইলাতুল মুবারকা বলতে লাইতুল ক্বদরকেই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অতএব, লাইলাতুল মুবারকা বা মুবারক রজনীর ব্যাখ্যায় মধ্য শা'বান রজনীর উল্লেখ করার অর্থ আয়াতের স্পষ্ট অর্থ অপব্যাখ্যা করার শামিল। যা অন্ততঃ কোন মুফাসসিরের পক্ষে সমীচীন নয়।

অন্যদিকে কুরআন অবতীর্ণের রাত্রিকেও 'লাইলাতুল ক্বদর' বা 'মহিমান্বিত রজনী' বলা হয়েছে *(ক্বদর ৯৭/১)*। অন্যত্র 'লাইলাতুল মুবারকা' বলে উল্লেখিত হয়েছে। আর এ রাত্রিটি নিঃসন্দেহে রামাযান মাসে; কেননা তিনি রামাযান মাসেই কুরআন নাযিল করেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। অতএব 'মুবারক রজনী' রামাযান মাসে, শা'বান মাসে নয়।

হাদীছ থেকে দলীল :

১ম দলীল : ইবনে মাজাহ ও দারাকুৎনীতে আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ।

عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلاَ مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلاَ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ–

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ১৫-ই শা'বানের রাত আসলে তোমরা ঐ রাত্রিতে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে এবং ঐ দিন ছিয়াম পালন করবে। কেননা ঐ দিন সূর্য ডোবার পর আল্লাহ্ দুনিয়ার নিকটস্থ আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। আছে কি কোন রিযিক্বপ্রার্থী? আমি তাকে রিযিক্ব প্রদান করব। আছে কি কোন অসুস্থ ব্যক্তি? আমি তাকে সুস্থতা দান করব। ফজরের সময় হওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই বলতে থাকেন'।[৮৭]

তাহক্বীক্ব : এই হাদীছটির সনদ সকল মুহাদ্দিছের ঐক্যমত্যে ভিত্তিহীন ও দুর্বল। উক্ত হাদীছের সনদে আবুবকর ইবনু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আবি সাবরাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইবনু মাঈন (রহঃ) বলেন, সে হাদীছ জাল করত। আলী ইবনুল মাদিনী (রহঃ) বলেন, সে হাদীছ বর্ণনায় দুর্বল ছিল। আল্লামা জাওযানী (রহঃ) বলেন, তার বর্ণিত হাদীছকে যঈফ ধরা হয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাদীছ বর্ণনায় সে দুর্বল। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) বলেন, সে পরিত্যাজ্য। ইবনু হিবক্ষান (রহঃ) বলেন, সে মওযু' হাদীছ বর্ণনাকারীর অন্ত ভুক্ত ছিল, তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ বৈধ নয়। ইবনু হাজার

---

৭৯. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৬/৪২২ পৃঃ।
৮০. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৬/৪২২ পৃঃ।
৮১. আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর আল-কুরাশী আদ-দিমাশক্বী (৭০০-৭৭৪ হিঃ), তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/১২৩।
৮২. ইমাম জারীর আত-তাবারী, তাফসীরে তাবারী ৮/২২ পৃঃ।
৮৩. আবুবকর আল-জাসসাস, তাফসীরে আহকামুল কুরআন ৪/১৬৯০ পৃঃ।
৮৪. তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর ৬/৪২২ পৃঃ।
৮৫. তাফসীরে ইবনে আবক্ষাস ২/১৬ পৃঃ।
৮৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, অনুবাদ : মাওলানা মহিউদ্দীন খাঁন, পৃঃ ১২৩৫।
৮৭. ইবনে মাজাহ, পৃঃ ৯৯, হা/১৪৫১।

আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সকল মুহাদ্দিছ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন।[৮৮] আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ হাদীছটিকে খুবই দুর্বল এমনকি ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন।[৮৯] এছাড়াও এ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা কুতুবে সিত্তাহ সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে 'মধ্য শা'বানের' কথা উল্লেখ নেই; বরং প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশের কথা ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি হল,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মহান আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ রাত বাকী থাকতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আমায় ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে চাইবে? তাকে তা দিয়ে দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? তাকে আমি ক্ষমা করে দিব'।[৯০]

২য় দলীল : তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমাদে বর্ণিত হাদীছ,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোন একরাতে আমি নবী (ছাঃ)-কে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। অতঃপর তাঁকে বাক্বী কবরস্থানে দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, হে আয়েশা! তোমার কি আশঙ্কা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার উপর অবিচার করবেন? আমি বললাম, বরং আমি ভেবেছি আপনি আপনার অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, মহান আল্লাহ ১৫ই শা'বানের রাতে দুনিয়ার নিকটস্থ আকাশে অবতরণ করেন এবং কাল্ব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়ে অধিক লোককে ক্ষমা করেন'।[৯১]

তাহক্বীক্ব : উক্ত হাদীছের সনদ বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি উদ্ধৃত করে এর দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টিকে আরো নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন,

حَدِيثُ عَائِشَةَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَعِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ.

'আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীছটি হাজ্জাজের এ সনদ ব্যতীত অন্য কোনভাবে আমরা অবগত নই। আমি মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারীকে) এ হাদীছের দুর্বলতা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, ইয়াহইয়া বিন আবু কাছীর উরওয়াহ থেকে শ্রবণ করেননি এবং হাজ্জাজ ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাছির থেকে শ্রবণ করেননি।[৯২] সুতরাং বিষয়টি পরিষ্কার।

৩য় দলীল : ইবনু মাজাহতে বর্ণিত আরেকটি হাদীছ,

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ মধ্য শা'বানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন'।[৯৩]

তাহক্বীক্ব : উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু লাহিয়া আল-হাযরামী হাদীছ মুখস্থ ও বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বল। বিশেষতঃ তার পাণ্ডুলিপি পুড়ে যাওয়ার পর। যেমন ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, সে صدوق বা সপ্তম স্তরের রাবী। তবে তার পাণ্ডুলিপি পুড়ে যাওয়ার পর তিনি তার বর্ণিত হাদীছে সংমিশ্রণ করতেন। ইবনুল জুনায়েদ বলেছেন, ليس بشي 'সে কিছুই নয়'। আল্লামা জাওযানী বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীছের উপর নির্ভর করা যায় না এবং তার দ্বারা দলীলও গ্রহণ করা বৈধ নয়। আবু যুর'আ বলেছেন, সে ضبط-এর গুণ সম্পন্ন ছিল না। হাকেম বলেন, তিনি হাদীছ জালকারী।[৯৪] এ ছাড়া বুসাইরী বলেন, ইবনু লাহিয়ার দুর্বলতার কারণে আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের সনদ দুর্বল।[৯৫]

৪র্থ দলীল : বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছ,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ...وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ.

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত

---

৮৮. قال إبن حنبل ليس بشئ كان يضع الحديث، قال ابن معين ليس حديثه بشئ، قال ابن المديني كان ضعيفا في الحديث، قال الجوزجاني يضعف حديثه، قال البخاري ضعيف، قال النسائ متروك الحديث، قال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ، قال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به.-ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ), আত-তাক্বরীবুত তাহযীব, তাহক্বীক্ব : শায়খ খলীল মামূন শীহা (বৈরূত : দারুল মা'রেফাহ, ২য় সংস্করণ ১৪১৭ হিঃ/১৯৯৭ খ্রিঃ) ২/৪০৫ পৃঃ, রাবী নং-৯০৭০।

৮৯. সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২, যঈফ ইবনু মাজাহ, পৃঃ ১৩৬, হা/১৪০৭ এর টীকা দ্রঃ।

৯০. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/১৬৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৬৬।

৯১. তিরমিযী ১/১৫৬, হা/৭৩৯; ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯৯, হা/১৩৮৯।

৯২. তিরমিযী ১/১৫৬ পৃঃ, হা/৭৪৪।

৯৩. ইবনু মাজাহ্, পৃঃ ৯৯, হা/১৩৯০।

৯৪. قال ابن المنجيد : ليس بشئ، قال الجوزجاني : لا يتوقف علي حديثه ولا ينبغي أن يحتج به، قال أبو زرعة : كان لا يضبط، قال الحاكم : ذاهب الحديث.-তাক্বরীবুত তাহযীব ১/৪১৭ পৃঃ, রাবী নং-৩৯৪৫।

৯৫. যাওয়ায়েদু ইবনু মাজাহ, পৃঃ ২০৩।

অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন।[৯৬]

পর্যালোচনা :

বুখারী ও মুসলিমের উক্ত হাদীছ দ্বারা শা'বান মাসের ফযীলাত সাব্যস্ত হলেও এ হাদীছকে পুঁজি করে মধ্য শা'বানের রাতে 'শবেবরাত-এর নামে নতুন কোন ইবাদতের জন্ম দেওয়া বৈধ নয়। কারণ 'শবেবরাত'-এর কোন অস্তিত্ব ইসলামে থাকলে ছাহাবায়ে কেরামগণ তাদের জীবনে আগেই তা পালন করতেন। কেননা তাঁরা আমাদের চেয়ে বেশী কল্যাণকামী। কিন্তু তারা কেউ তা করেননি।

শবেবরাত কেন্দ্রিক প্রচলিত বিদ'আত সমূহ

১. ছালাতুল আলফিয়া বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় :

এ রাত্রিতে ১০০ রাক'আত ছালাতের পক্ষে যে সব হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, মুহাদ্দিছগণের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী তার সবগুলোই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। যা হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে রচনা করে প্রচার করা হয়েছে। তাঁরা একমত যে, শবেবরাতের রাত্রিতে নির্দিষ্ট রাক'আত ছালাত, নির্দিষ্ট সূরা পাঠ করার অর্থে বর্ণিত সকল হাদীছই বানোয়াট এবং গল্পকার ওয়ায়েযীনদের মস্তিষ্ক প্রসূত কথা। মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) اللالي 'আল-লা'লী' কিতাবের বরাত দিয়ে বলেন,

ومما أحدث في ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية مائة ركعة بالإخلاص عشرا عشرا بالجماعة واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد لم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع.

'জুমআ' ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'মধ্য শা'বানের' রাতে ছালাতুল আলফিয়্যাহ বা ১০০ রাক'আত ছালাত নামে জামা'আতের সাথে যে ছালাত আদায় করা হয়, যাতে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই যঈফ ও মাওযূ'।[৯৭]

হাফেয ইরাক্বী বলেন, শবেবরাতের ছালাত সম্পর্কিত হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তৈরী করা হয়েছে এবং এর দ্বারা তাঁর উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে। ইমাম নববী (রহঃ) স্বীয় المجموع কিতাবে বলেন, 'ছালাতুর রাগায়েব' নামে প্রসিদ্ধ ১২ রাক'আত ছালাত রজব মাসের প্রথম জুম'আর রাত্রিতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে পড়া হয়ে থাকে এবং মধ্য শা'বানের রাত্রিতে যে ১০০ রাক'আত ছালাত চালু করা হয়েছে- এই দুই ধরণের ছালাতই অতীব নিন্দনীয় বিদ'আত (منكرتان بدعاتان)।

আবু তালেব মাক্কীর 'কূতুল কুলূব' (قوت القلوب) ও ইমাম গায্যালীর 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' (إحياء علوم الدين) কিতাবে তার উল্লেখ দেখে এবং এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ দেখে কেউ যেন ধোঁকায় না পড়েন। এমনিভাবে কিছু সংখ্যক আলেম, যারা উক্ত বিষয়ে সন্দেহের ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হয়েছেন এবং উক্ত ছালাতদ্বয় মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে কিছু পৃষ্ঠা প্রণয়ন করেছেন, তাদের ঐসব দেখে কেউ যেন প্রতারিত না হন। কেননা তারা প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে ভুল করেছেন (غالط في ذالك)।[৯৮]

২. 'অর্ধ শা'বান'-এর রাত্রিকে 'ভাগ্য রজনী' বলে মনে করা :

নিঃসন্দেহে এটা বিদ'আত। কেননা ভাগ্য রজনী বলে কোন রাত থেকে থাকলে তা রামাযান মাসের লাইলাতুল ক্বদর। কেননা এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। তাই বলে ২৭ রামাযানকে নির্দিষ্ট করে, সরকারী ছুটি ঘোষণা করে, আতোশবাজী আর ফটকাবাজীর মাধ্যমে মহা ধুমধামে যেভাবে এ দেশে শবেবরাত পালন করা হয়, তা শরী'আতের নামে মন্দ চর্চারই নামান্তর।

৩. বয়স ও রূযী বৃদ্ধির ধারণা করা :

এ রাতের আরো একটি মন্দ আক্বীদা হল বান্দার বয়স ও রূযী না-কি এ রাতেই বৃদ্ধি করা হয়। আগামী এক বছরের রূযী নির্ধারণ করা হয়। অত্র বছরে কতজন জন্মগ্রহণ করবে ও কতজন মৃত্যুবরণ করবে তা ধার্য্য করা হয় বলে ধারণা করা হয়। অথচ এগুলো স্পষ্ট বিদ'আত।

৪. অর্ধ শা'বানের রাতে ও দিনে ব্যাপকভাবে কবর যিয়ারত করা, কবরে ফুল দান করা, বাতি জ্বালান হয়। এগুলো সবই ঘৃণিত বিদ'আত।

৫. হালুয়া-রুটি ও রকমারী খাদ্য প্রস্তুত করা :

ফযীলতের আশায় এ রাত্রিতে হালুয়া-রুটি তৈরী করা, খাওয়া, বিতরণ করা সবই বানোয়াট, ভিত্তিহীন, অপসংস্কৃতি ও বিদ'আত। এ রাত্রিতে এ সকল কাজ করলে কোন বিশেষ নেকী পাওয়া যাবে মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ওহুদ যুদ্ধে আহত হন এবং তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়, তখন তিনি হালুয়া খেয়েছিলেন' তাই এ রাতে হালুয়া-রুটি তৈরী ও বিতরণ করতে হয়। এটা ভ্রান্ত ধারণা। তাছাড়া ওহুদের যুদ্ধ হয়েছিল শাওয়াল মাসে, আর শবেবরাত পালন হয় শা'বান মাসে। এ থেকেই বুঝা যায় এটা ভিত্তিহীন।

৬. বিধবা মহিলাদের মৃত স্বামীর আগমনের ভ্রান্ত ধারনা :

বিধবা মহিলারা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, এই রাতে তাদের স্বামীগণ বাড়ীতে ফেরত আসেন। এ জন্য তারা সাজ-সজ্জা করে, দানা-পানি তৈরী করে, মোমবাতি বা ধোপ কাটি জ্বালিয়ে গোসল করে ভিজা কাপড়ে সারা রাত অপেক্ষায় থাকে। যা ধর্মের নামে স্পষ্ট জাহেলিয়াত।

৭. ব্যাপকভাবে পাড়া-গ্রাম ও শহর-মহল্লায় আলোক সজ্জা ও আগুন জ্বালানো :

এটি ইসলামের নামে কুসংস্কার মাত্র। আল্লামা আবু শামাহ বলেন, বিদ'আতীগণ যে সমস্ত নবাবিষ্কার করেছে ও উহার মাধ্যমে দ্বীনের নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং অগ্নি পূজকদের তুরীকা অবলম্বন করেছে এবং নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়েছে ঐ সকল বিদ'আতের অন্যতম একটি বিদ'আত হল অর্ধ শা'বানের রাতে ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালানো। সর্বপ্রথম এই বিদ'আতের প্রচলন ঘটায় ছদ্মবেশী বারামেকাগণ। এরা ছিল মাজূস বা অগ্নিপূজকদের গোপন নেতৃবৃন্দ। এরা বাদশাহ হারুনুর রশীদকে পরামর্শ দিয়েছিল পবিত্র কা'বা ঘরে সুগন্ধি (চন্দন কাঠ) পুড়ানোর জন্য, যাতে ইহার অনুসরণে সুগন্ধির নামে মুসলমানদের মসজিদ ও ইবাদতখানা গুলোতে আগুন ঢুকে যায়।[৯৯]

৮. লাইলাতুল ক্বদর ও অর্ধ শা'বানের রাত্রির ফযীলত এক সমান বা তার চেয়ে বেশী মনে করা। যা ইসলামের নামে চরম ভ্রষ্টতা ও বিদ'আত।[১০০]

৯৬. বুখারী ও মুসলিম হা/২৭৭৭, মিশকাত হা/২০৩৬।
৯৭. মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৩/৩৫০ পৃঃ।
৯৮. আত-তাহযীরু মিনাল বিদ'আ ২৫ পৃঃ, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব অনূদিত 'বিদ'আত হতে সাবধান' গ্রন্থ দ্র.।
৯৯. আল ইবদা' ফী মাযা-ররিল ইব্‌তিদা', পৃঃ ২৮৯। গৃহীত : 'শবেবরাত সমাধান', পৃঃ ৩১।
১০০. তাহযীরুল মুসলিমীন, পৃঃ ৬৮৭।

৯. এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, এই রাতে মুমিনদের রূহগুলো ঈল্লিন থেকে দুনিয়ায় নেমে আসে। আর এটা প্রমাণ করার জন্য সূরা ক্বদরের تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ আয়াতে বর্ণিত 'রূহ' বলতে মৃর্দা ব্যক্তিদের রূহ নেওয়া বিরাট ধরনের মূর্খতা। কোন নির্ভরযোগ্য মুফাসসির এই তাফসীর করেননি। কেননা তারা রূহ অর্থ জিব্রীল আমীন কিংবা একবিশেষ ধরনের সম্মানিত ফেরেশতা কিংবা ফেরেশতা ব্যতীত আল্লাহ্র বিশেষ কোন বাহিনী করেছেন। আবার কখনো রূহ অর্থ রহমত করেছেন।[১০১]

১০. 'অর্ধ শা'বান' উপলক্ষে বিভিন্ন দো'আ অনুষ্ঠান, মিলাদ ও বিভিন্ন প্রকারের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যা স্পষ্ট বিদ'আত। অন্যদিকে এর জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করা নিঃসন্দেহে অহেতুক কাজ মাত্র। এর দ্বারা কেবলমাত্র শয়তানের সাথে ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

প্রচলিত কিছু কুসংস্কার :

১. গোসলের ফযীলত :

শবেবরাতের রাতের গোসল করার ফযীলত নিয়ে প্রচলিত কিছু বই ও লোকমুখে বেশ কিছু কথা চালু আছে। ওয়ায মাহফিলগুলোতে বক্তাদের মুখে এ কথাগুলো প্রায়ই শুনা যায়। যেমন একটি হাদীছে আছে, উক্ত রাত্রিতে যে ব্যক্তি ইবাদতের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় গোসল করিবে, সে ব্যক্তির গোসলের প্রত্যেকটি পানির বিন্দুর পরিবর্তে তাহার আমলনামায় ৭০০ (সাতশ') রাক'আত নফল নামাযের সওয়াব লিখা যাইবে। গোসল করিয়া দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল অজুর নামাজ পড়িবে'।[১০২]

পর্যালোচনা : এটি ডাহা মিথ্যা কথ। অথচ প্রতারিত হয়ে কঠিন শীতের রাতেও অনেকে গোসল করেন। উপরন্তু ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ার আশায় অনেকে শরীর ও মাথা ভাল করে মুছেন না। যা পন্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. শবেবরাতের আমলসমূহ :

'ইসলামিক ফাউ-শন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত একটি বইয়ে শবেবরাতের রাতের আমলসমূহের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'এই পবিত্র রাতে ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যরূরী। সূর্যাস্তের পর থেকেই রাতটির সূচনা। উত্তমরূপে গোসল করে পবিত্র পোশাক পরিধান করে এবং আতর-সুগন্ধি মেখে মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত নফল নামায 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' পড়বেন। অতঃপর ইমামের সাথে এশার নামায জামায়াতে আদায় করা এবং সুন্নাত দু'রাক'আতের পর শবেবরাতের নামায পড়তে থাকবেন। এক সালামে দু'রাক'আত করে' *(সুনান আবু দাউদ, হা/১২৯৫)*। 'এই পবিত্র ও মহিমান্বিত রাতটি দান-খয়রাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির- আযকার, দু'আ-দরূদ, তওবা-ইসতিগফার, কবর যিয়ারত ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করবেন'।[১০৩]

পর্যালোচনা :

উক্ত বর্ণনার পরে কোন প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি। অথচ এটিই হচ্ছে আমাদের দেশের সরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বীন প্রচারের নমুনা।

৩. শবেবরাতের রাত্রি জাগরণের ফযীলত :

মকছেদুল মো'মেনীন গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'হাদীছে আছে, যাহারা এই রাত্রিতে ইবাদত করিবে আল্লাহ তা'আলা আপন খাছ রহমত ও স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা তাহাদের শরীরকে দোজখের অগ্নির উপর হারাম করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে কখনও দোজখে নিক্ষেপ করিবেন না'। আরো বলা হয়েছে, 'আমি জিবরাইল (আঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি, যাহারা শা'বানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে জাগিয়া এবাদত-বন্দেগী করিবে, তাহারা শবে ক্বদরের এবাদতের সমতুল্য ছওয়াব পাইবে'। আরও একটি হাদীছে আছে, হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, 'শা'বানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে ইবাদতকারী আলেম, ফাযেল, অলী, গাউছ, কুতুব, ফকীর, দরবেশ, ছিদ্দীক, শহীদ, পাপী ও নিষ্পাপ সমস্ত কে আল্লাহ তা'আলা মার্জনা করিবেন'। কিন্তু জাদুকর, গণক, বখীল, শরাবখোর, যেনাকার, নেশাখোর ও পিতা-মাতাকে কষ্টদাতা-এই কয়জনকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করিবেন না। আরও একটি হাদীছে আছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা শা'বানের চাঁদের ১৫ই তারিখের রাত্রিতে ৩০০ খাছ রহমতের দরজা খুলিয়া দেন ও তাঁহার বান্দাদের উপর বে-শুমার রহমত বর্ষণ করিতে থাকেন'। হাদীছে আছে, 'শা'বানের চাঁদের ১৪ তারিখের সূর্য অস্ত যাইবার সময় নিম্নলিখিত দো'আ (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) ৪০ বার পাঠ করিলে ৪০ বছরের ছগীরা গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে'।

হাদীছ শরীফে আছে, 'যাহারা এই নামায আদায় করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ মার্জনা করিয়া দিবেন' *(তিরমিজী)*।

আরও হাদীছে আছে, 'যাহারা উক্ত দিনে বা রাত্রে ১০০ হইতে ৩০০ মরতবা দরূদ শরীফ হযরত (সাঃ)-এর উপর পাঠ করিবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর দোজখ হারাম করিবেন। হযরত (সাঃ)-ও সুপারিশ করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতে লইবেন' *(সহীহ বুখারী)*। আর যাহারা উক্ত রাত্রিতে সূরা দোখান সাতবার ও সূরা ইয়াসীন তিন পাঠ করিবে, আল্লাহ তাহাদের তিনটি মকছুদ পুরা করিবেন। যথা : (১) হায়াত বৃদ্ধি করিবেন। (২) রুজি-রেজক বৃদ্ধি করিবেন। (৩) সমস্ত পাপ মার্জনা করিবেন।[১০৪]

পর্যালোচনা :

উক্ত কথাগুলো সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। পরিতাপের বিষয় হল- গ্রন্থকার এখানে বুখারী, মেশকাত, আবুদাউদ ও তিরমিযীর মত হাদীছগ্রন্থ সমূহের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেন গ্রহণযোগ্যতা পায়। অথচ এ গ্রন্থগুলো তো দূরের কথা অন্য কোন হাদীছের গ্রন্থেও নেই। এর দ্বারা এ দেশের সরলপ্রাণ মুসলিমের বিবেক নিয়ে খেলা করা হয়েছে মাত্র। আসলে প্রচলিত এ ধরনের গ্রন্থগুলো জাল ও মিথ্যা কথায় ভরা। এ ধরণের গ্রন্থ পাঠ থেকে আমাদের সতর্ক থাকা উচিৎ।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, মধ্য শা'বানের রজনীতে শবেবরাত পালন যদি এতই পূণ্যের কাজ হবে, তবে রাসূল (ছাঃ) অবশ্যই তাঁর ছাহাবীদের জানিয়ে যেতেন, তিনি নিজে করতেন এবং তাঁর ছাহাবীগণও তার উপর আমল করতেন। কারণ তাঁরাই ইসলামের বাস্তব রূপকার। অনেকে আবার অর্ধ শা'বানের রাত ও দিনের সাথে সম্পৃক্ত বিদ'আতগুলোকে 'বিদ'আতে হাসানাহ' নাম দিয়ে পালন করা বৈধ মনে করে। অথচ এ ধরণের কথা সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীছ বিরোধী ও সুস্পষ্ট বিদ'আত। আর এক শ্রেণীর তথাকথিত আলেম সমাজ বিদ'আতে হাসানাহ আর বিদ'আতে সায়ইয়া-র ধুয়া তুলে উক্ত বিদ'আত উদ্‌যাপন করছেন। মহান আল্লাহ আমাদের ও তাদেরকে সঠিকভাবে শরী'আত বুঝার তাওফীক দিন-আমীন!!

[লেখক : ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও দাওরায়ে হাদীছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

---

১০১. তাফসীর ইবনে কাছীর ৪/৪৮৪ পৃঃ, ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৬৭১ পৃঃ-এর বরাতে 'শবেবরাত সমাধান'-৩১ পৃঃ।

১০২. মকছেদুল মো'মেনীন, পৃ: ২৪০।

১০৩. সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম ১০০-১০১ পৃ:, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত, জুন- ২০১২।

১০৪. মাওলানা গোলাম রহমান, মকছেদুল মো'মেনীন, পৃ: ২৪০। বিস্তারিত: কোরআন-সুন্নাহর আলোকে শবেবরাত: ফযীলাত ও আমাল, ৫২ পৃ: খন্দকার ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর প্রণীত।

গণতন্ত্রের কদাকার অভিলাশ : ইসলামী নেতৃত্বের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম

ভূমিকা :

মানুষের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতসমূহের মধ্যে অন্যতম নে'মত হল নেতৃত্বের যোগ্যতা। নেতৃত্ব একটি গোষ্ঠীর অভ্যন্তরস্থ সম্পর্কের মাধ্যমে উদ্ভুত একটি দ্বিমুখী সম্পর্কের নাম। নেতৃত্বের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং বলেন,

Leadership is one from of dominance, in which the followers more or less willingly to accept direction and control by another.

'নেতৃত্ব হল ব্যক্তির সেই গুণাবলী, যার মাধ্যমে সে অন্যদের কর্মধারা প্রভাবিত করে এবং অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে' *(আহলেহাদীছ যুবসংঘ স্মারকগ্রন্থ, পৃঃ ২১৫)*। নেতৃত্ব জন্মগত, এটা সৃজনশীলগত নয়। নেতৃত্বের সনাতন ভাবধারায় বলা হয়েছে, Leaders are born, not made। কিন্তু নেতৃত্ব আজকে আমরা সৃজনশীল হিসাবে তৈরি করেছি। নষ্ট নেতৃত্বের ফলে হিংসা-বিদ্বেষ অত্যাচার-রাহাজানি, গুম, হত্যা, ধর্ষণ সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীক শৃঙ্খলা আনয়ন, স্থিতিশীল, গতিময় ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে নেতৃত্ব একটি অপরিহার্য প্রসঙ্গ। নেতৃত্ব একটি ব্যক্তিক ও সামষ্টিক বিষয়। তাই সাধারণ নেতৃত্ব থেকেই রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বিকশিত হয়ে থাকে। একজন রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন আর একজন রাজনীতিবিদ বড় জোড় সেবা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। টমাস জেফারসন বলেছিলেন, Politician thinks for the next election; but statesman thinks for the next generation.

গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের স্বরূপ

◈ দলীয় স্বার্থে নেতৃত্ব ব্যবস্থা :

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, Democracy is a government of the people, by the people and for the people. 'গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা মানুষের উপর মানুষের দ্বারা পরিচালিত মানুষের প্রভুত্বভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়'। উক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হলেও কিন্তু মূলে জনগণের শাসনের পরিবর্তে তারা দলীয় ক্যাডারবাজী, সন্ত্রাসী, টেন্ডারবাজী করে। দেশের ও জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিতে তারা সদা প্রস্তুত থাকে। কারণ গণতন্ত্রের অপর নাম দলতন্ত্র। দলীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে তারা হত্যা, গুম, রাহাজানী করতেও তোয়াক্কা করে না। এমনকি মানবাধিকারকে তারা পরোয়া করে না।

বাংলাদেশের মানুষ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যক্ষ করেছে। উপযেলা নির্বাচন হয়ে গেল। যারা ভোট করে জিতেছেন তারা চাইবেন আগামী পাঁচ বছর সিংহাসন আগলে রাখতে। যারা ভোট বর্জন করেছেন তাদের লক্ষ্য হল যত দ্রুত সম্ভব সরকারকে বিতাড়িত করে সিংহাসন দখল করা। সুতরাং প্রয়োজন হবে ভোটাযুদ্ধ কিংবা প্রত্যক্ষ বিপপ্লবের। ফলে শুরু হবে অরাজকতা, বিনষ্ট হবে অবকাঠামো, প্রাণ ঝরবে অসহায় সাধারণ জনগণের। যারা পরিণত হবে স্বার্থপর রাজনীতির হিংস্র খোরাকে। আগামী দিনের বিপপ্লব শুধু জনগণের উপর নির্ভরশীল নয়, বহিঃশক্তির চাপও প্রয়োজন।

স্মরণযোগ্য যে, বহিঃশক্তি আমাদের প্রতিবেশী হোক কিংবা অন্য দেশের হোক নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কেউ বাংলার গণতন্ত্র রক্ষায় হস্তক্ষেপ করতে আসবে না। কিন্তু আমরা আমাদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য দেশের স্বার্থকে বিনাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করি না। আজকের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিপক্ষ পাকিস্তানকে আমরা ক্ষমা চাইতে বলি। অথচ সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি না। কারণ সে ক্ষমতা তার নেই। ভারত তিস্তার পানি, সিটমহল সমস্যার সমাধান করেনি বলে আমরা জোরগলায় কোন শব্দ করতে পারি না এবং দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণও করতে পারি না। ক্ষমতা হারানোর ভয়ে নীরবতা পালন করে থাকি। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিতব্য 'ইসলামী সম্মেলন সংস্থা' (ও.আই.সি)-এর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব যখন আসে তখনও পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারপরেও ভারতের আপত্তি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু ছুটে যান পাকিস্তানে। সেদিন শেখ মুজিব শুধুমাত্র দেশের স্বার্থের জন্য পাকিস্তানে ছুটে গিয়েছিলেন; চেয়েছিলেন মুসলিম ঐক্য বজায় রাখতে; দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে। অসময়ে চলে গেছেন তিনি। তিনি গত হওয়ার পর নেতৃত্বশূন্য বাংলাদেশের হাল ধরেন জিয়াউর রহমান। তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শেখ ছাহেবের দল যেমন তার দিকনির্দেশনা সম্পর্কে অজ্ঞ ঠিক তেমনি জিয়াউর রহমানের দলও তার দিকনির্দেশনা সম্পর্কে অজ্ঞ।

◈ স্বার্থোদ্ধত নেতৃত্ব ব্যবস্থা :

গণতাান্ত্রিক রাজনীতিতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হলেন চরম স্বার্থান্বেষী। কারণ দলের জন্য তৈরি করেছেন ক্যাডার বাহিনী। জোর করে দখল করছে ক্ষমতা, ক্ষমতা টিকে রাখার জন্য তৈরি করছে বিভিন্ন নীল নকশা। দেশ এখন গণতন্ত্রের জন্য পাগল। মানুষ পুড়ুক আর মানুষ মরুক, সবই গণতন্ত্রের জন্য। তবে আসামীর কাঠগড়ায় কোন মানুষ নয়, খাড়া করা হয়েছে বেচারা হরতাল, অবরোধকে। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষমতা টিকে রাখার জন্য সংশোধন করা হচ্ছে সংবিধানকে। পরিবর্তন করে ফেলছে নীতি-নৈতিকতাকে।

স্মরণ করুন ৪ ডিসেম্বর ১৯৯০-এর রাতের কথা। বাংলাদেশ বেতার ও বিটিভিতে ৪ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত কিছুক্ষণ পর পর দু'টি ভাষণ প্রচারিত হতে থাকে। ভাষণ দু'টি ছিল মাত্র কয়েক মিনিটের। একটি ভাষণে বলা হয়েছিল,

'শত শহীদের আত্মহুতির বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের অগ্রযাত্রাকে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার আলোকে তিনজোট কর্তৃত ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্ত ান্তরের পর অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হয় ও জনগণ যাতে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেই পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, স্বৈরচারবিরোধী আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে দেশবাসী যেমনিভাবে চলমান আন্দোলনকে বর্তমান পর্যায়ে এনে উপনীত করেছেন, তেমনিভাবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অতীতের ন্যায় দৃঢ় ভূমিকা পালন করবেন। শত শহীদের রক্তের প্রতি আমাদের এই অঙ্গীকার পালনে আমি দেশবাসীর সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি'।

দ্বিতীয় ভাষণটি ছিল, 'আপনাদের সকলের আন্দোলনের ফলে স্বৈরতন্ত্রের পতন হয়েছে; কিন্তু আন্দোলনের মূল লক্ষ্য গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একটি সুখী সমাজ গড়ে তোলার কাজ আমাদের শুরু করতে হবে। এই পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর। আজ এ জন্য আমাদের সকলকে হতে হবে ধৈর্যশীল ও সংযমী। ভাবাবেগে জড়িত যে কোন ধরনের উচ্ছলতা আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। পরিণামে দেশ ও জনগণের জীবনে নেমে আসবে হতাশা'।

প্রথম ভাষণটি ৮-দলীয় জোটের নেতা শেখ হাসিনার; দ্বিতীয়টি ছিল ৭ দলীয় জোটের নেতা খালেদা জিয়ার। তারা তো আছেনই, তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আরও অনেক গণতন্ত্রের মানস্ সন্তান। যারা ধর্ম কিংবা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থের জন্য দল পরিবর্তন করেন। ১৯৮৬ সালে এরশাদের পাতানো নির্বাচনে বি.এন.পিকে বাদ দিয়ে আওয়ামীলীগ ও জামায়াত একসঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। আবার ১৯৯১ সালে জামায়াত বিএনপিকে সর্মথন দেয়। ১৯৯৬ সালে পুনরায় জামায়াত ও আওয়ামীলীগ বিএনপির বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের পতন ঘটায়। পুনরায় ২০০১-এ জামায়াত ও বিএনপি সরকার গঠন করে। ধিক এই স্বার্থবাদী গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের! যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য হারামকেও হালাল জ্ঞান করতে প্রস্তুত।

◈ স্বার্থদ্বন্দ রাজনীতির স্বরূপ :

স্বার্থদ্বন্দ রাজনীতি নেতাদের উদ্দেশ্য থাকে মানুষ পুড়ুক বা মরুক গণতন্ত্র তাদের চাই। বঙ্গীয় গণতন্ত্রের অপর নাম ক্ষমতা, মন্ত্রিত্ব, এমপিত্ব ও প্রাপ্তি বাড়ি-গাড়ি, রাজউকের প্লট, সরকারী খাসজমি, পাহাড়-বনভূমি, নদীর পাড়, নদীর বুকের ভেতরকার বালু! যার উপর চোখ পড়বে সেটি তার। এটি গণতন্ত্রের প্রাপ্তি। তবে গণতন্ত্র চর্চায় মূল্য দিতে হয়। মূল্য মানে টাকা-রুপি-ডলার-পাউন্ড-ইউরো নয়; রক্ত ও জীবন। সে রক্ত ও জীবন নেতাদের সন্তানদের নয়, কোন সরকার প্রধান বা মন্ত্রীর ছেলে-মেয়ের নয়; পথ-ঘাটের সাধারণ জনতার।

◈ একদলীয় শাসনের মানসিকতা :

আমাদের দেশে যখন যে দল ক্ষমতায় আসে তখন তারা একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ১৯৮৩ সালে ৮ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট এবং ৫ দলীয় মোর্চা একটি পাঁচদফা দাবিনামা তৈরি করেছিল। তার ভিত্তিতেই সাড়ে আট বছর আন্দোলন হয় এবং অন্তত সাড়ে ৮০০ মানুষ আত্মহুতি দেন। লক্ষ্য একটাই ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নির্দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, যাতে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়। সেদিনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া। ১৯৮৩ সালের রূপরেখা ১৯৯৩-তেই কলার খোসায় পরিণত হয়। রাজপথে সাধারণ জনগণের লাশের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৫-৯৬-তে শুরু হয় রাজনৈতিক সহিংসতা। তত্ত্বাবধায়ক ফিরে এল, শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এলেন। তাঁরই আন্দোলনের ফলে লিপিবদ্ধ সাংবিধানিক আইন তত্ত্বাবধায়ক প্রথায় ২০০১ সালে নির্বাচনে তার দল পরাজিত হয়। অন্যদিকে যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেগম জিয়া চাননি, তার অধীনে নির্বাচন করেই তিনি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। যে তত্ত্বাবধায়ক মহাজোটকে গদিনশীন করে তার উপরেই চাপাতি চালায় সরকার। তাকে নিক্ষেপ করে বুড়িগঙ্গার দূষিত পানিতে।

◈ গুম ও আতঙ্কের নেতৃত্ব ব্যবস্থা :

বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট গুম, খুন ও আতঙ্কের। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ২০১০-২০১৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ২৬৮ জন অপহৃত হয়। ৪৩ জনের লাশ উদ্ধার; ফিরে এসেছে ২৪ জন। নিখোঁজ এখনো ১৮৭ জন। রাজনৈতিক সহ সর্বমহলে মানুষের মনে এক ভীতি ও আতঙ্ক কাজ করছে, কখন না-জানি সে অপহরণ হয়ে যায়, গুম হয়ে যায়; চাইবে কোটি কোটি টাকা। টাকা না দিলে লাশ ভাসবে শীতলক্ষ্যা, যুমনা, করতোয়া, মেঘনার পানিতে। কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা দেওয়ার পরও তাকে জীবন দিতে হচ্ছে। এতগুলো মানুষ অপহরণ হওয়ার পরও সরকার নাকের ডোগায় তৈল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এইতো ২৭ এপ্রিলে অপহরণ হল নারায়ণগঞ্জের সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম ও জ্যৈষ্ট আইনজীবি চন্দন সরকার সহ ৭ জন। অতঃপর তিনদিন পর ৩০ এপ্রিল ছয়জন ও পরদিন অন্যজনের লাশ শীতলক্ষ্যায় ভেসে ওঠে। ১১ মে Seven marder-এর সাথে জড়িত র‍্যাবের কর্মকতাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। ১৫ মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আসামীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পুলিশের মহাপরিদর্শকে চিঠি দেয়। এটা একটা বড় হাস্যকর, পরিতাপ ও দুঃখজনক ঘটনা। বিরোধী দলীয় কোন নেতা-কর্মীকে সরকার ১৪৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে অসংখ্য মামলা চাপিয়ে দিয়ে বন্দী করছে; সেখানে 7 Mardrer-এর মত ঘটনায় গোটা দেশ যখন হতভম্ব, ভ্যাবাচ্যাকা, স্তম্ভিত তখন ১৫ দিন পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশকে আসামী গ্রেপ্তারের চিঠি দিচ্ছে। অথচ ইচ্ছা করলে সরকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সকল আসামীকে গ্রেফতার করতে পারে; কিন্তু কেন যে সরকার এই খেলা খেলছে আল্লাহই ভাল জানেন। যদিও Seven marder-এর কয়েকজন আসামী র‍্যাব কর্মকর্তা গ্রেফতার হয়েছেন এবং অপহরণ ও হত্যার ব্যাপারে রিমান্ডে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

ইসলামী নেতৃত্বের স্বরূপ

◈ প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল :

পৃথিবীতে সকল ব্যক্তিই দায়িত্বশীল। আর সকল মানুষ স্ব স্ব দায়িত্বের জন্য আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন দেশের শাসক ও দলের প্রধান যেমন তার কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন ঠিক একজন পরিবারের প্রধানও তার পরিবার

সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। দেশের বা দলের কিংবা যে কোন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ যেন আমিত্ব, অহংসর্বস্বতা ও অহংজ্ঞানে স্ফীত হয়ে না উঠেন। এই জন্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'জেনে রাখ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল, সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী হা/৭১৩৮, ৮৯৩; মুসলিম হা/৪৬১৮)*।

◈ নেতৃত্বের অভিলাশ করা হারাম :

মানব রচিত মতবাদগুলোর নেতৃত্ব নির্বাচনের পদ্ধতি হল নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া। গণতন্ত্রে যার টাকা, ক্ষমতা ও প্রভাব আছে, যে বেশি অস্ত্র পরিচালনা করবে, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করবে, সমাজকে গুম, খুন ও রাহাজানীর রাজ্যে পরিণত করবে সেই হল নেতা। অথচ ইসলাম নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া হারাম ঘোষণা করেছে। হাদীছে এসেছে,

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا 'হে আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা! নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা যদি চাওয়ার পর তোমাকে তা দেওয়া হয়, তাহলে তার সকল দায়িত্বভার তোমার উপরই অর্পিত হবে। আর যদি না চাওয়া সত্ত্বেও তোমাকে তা দেয়া হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তোমাকে সহযোগিতা করা হবে' *(বুখারী হা/৬৬২২)*।

(২) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, একদা আমি এবং আমার দু'চাচাত ভাই নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। দু'জনের একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মহান আল্লাহ আপনাকে যে সমস্ত রাজ্যের কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন তার কতক অংশে আমাদেরকে প্রশাসক নিযুক্ত করুন। অপর জনও অনুরূপ বলল। তখন তিনি বললেন, إِنَّا وَاللَّهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. 'আল্লাহ্র কসম! আমরা এমন কাউকে নেতৃত্বে বসাই না, যে তার জন্য প্রার্থী হয় এবং লালায়িত হয়' *(মুসলিম হা/৪৮২১)*।

(৩) আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে লক্ষ করে বললেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّى أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِى لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ 'হে আবু যার! আমি দেখছি তুমি দুর্বল প্রকৃতির লোক আর আমি তোমার জন্য তাই পসন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য পসন্দ করি। কোন দু'ব্যক্তির উপরও কতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ কর না এবং ইয়াতীমের সম্পদের দায়িত্বশীল হতে যেয়ো না' *(মুসলিম হা/৪৮২৪)*।

◈ নেতৃত্ব মনস্তাপ ও ভর্ৎসনার কারণ :

ইসলাম নেতৃত্বের প্রতি লোভকে অপসন্দনীয় কাজ বলে ঘোষণা করেছে। নিস্প্রয়োজনে ক্ষমতায় যাওয়া অনভিপ্রেত। কিন্তু আমাদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতি লোভের প্রবণতা অনেক আকাঙ্খার। অথচ ক্বিয়ামতের দিন নেতৃত্ব লাঞ্চনা ও অনুশোচনার কারণ হবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সতর্ক করেছেন। তবে যে নেতৃত্বের হক্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে তার কথা ভিন্ন। হাদীছে এসেছে,

আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনি কি আমাকে প্রশাসক পদে দায়িত্ব প্রদান করবেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাত দিয়ে আমার কাঁধে আঘাত করে বললেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا. 'হে আবু যার! তুমি দুর্বল; অথচ এটি হচ্ছে আমানত। আর ক্বিয়ামতের দিন এটা হবে লাঞ্চনা ও অনুশোচনার কারণ। তবে যে এর হক্ব সম্পূর্ণ আদায় করবে তার কথা ভিন্ন' *(মুসলিম হা/৪৮২৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 'তোমরা নিশ্চয় নেতৃত্বের লোভ কর; অথচ ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াবে' *(বুখারী/৭১৪৮)*।

◈ নেতৃত্ব জান্নাত হারামের কারণ :

ইসলামী নেতৃত্ব হল জনগণের কল্যাণ কামনা করা। নেতাদের জন্য জনগণের তত্ত্বাবধান করা, কল্যাণ কামনা করা ফরয। কিন্তু গণতন্ত্রে মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ, মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল কামনা করাই নেতাদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। তারা সর্বদা নিজেদের কল্যাণের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত দুর্নীতিপরায়ণ নেতাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। যেমন-

ওবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (রহঃ) মা'কিল ইবনু ইয়াসারের (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মা'কিল (রাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করছি, যা আমি নবী করীম (ছাঃ) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ 'কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন। আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না' *(বুখারী হা/৭১৫০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব লাভ করল এবং তার মৃত্যু হল এই হালাতে যে, সে ছিল খিয়ানতকারী, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন' *(বুখারী হা/৭১৫১)*।

◈ নিষ্ঠুর নেতৃত্বের প্রতি নৃশংসতা আরোপ :

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবসময় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে পরবর্তী ক্ষমতা স্থায়ীকরণের অভিপ্রায়। আর যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষকে জান্নাতের পথে প্রতিবন্ধক তৈরী করে তাদের প্রতি ইসলামের নৃশংসতা আরোপ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ 'যে ব্যক্তি সামর্থ রাখে যে এক আঁজলা পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়ে তার ও জান্নাতের মাঝে বাধ সৃষ্টি করবে না, সে যেন অবশ্যই তা করে' *(বুখারী হা/৭১৫২)*। অন্যত্র তিন বলেন, اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. 'হে আল্লাহ! যে আমার উম্মতের কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে, তাহলে তুমি তার প্রতি রূঢ় হও। আর যে আমার উম্মতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে, তুমি তার প্রতি নম্র ও সদয় হও' *(মুসলিম হা/৪৮২৬)*।

◈ ঊধর্ক্ষতন কর্তৃক অধক্ষস্তনের জবাবদিহিতা :

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যা মানুষদেরকে সুশৃংখলার মধ্যে জীবন পরিচালনা করতে পথ প্রদর্শন করে। উর্ধক্ষতন নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে অধক্ষস্তন কর্মচারী দায়িত্বে অবহেলা করে না, দুর্নীতিপরায়ণ হয় না। কিন্তু গণতন্ত্রে কৈফিয়তের কোন বালাই নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্বাচনে জয়লাভ করছে। দুর্নীতি ও ঘুষের মাধ্যমে তার নির্বাচনী খরচের চাইতে অনেক টাকা ও সম্পদ অর্জন করছে। ক্বিয়ামতের দিন এই দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ তার ঘারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। হাদীছে এসেছে,

আবু হুমায়দ সাঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) ইবনু লুতাবিয়্যাকে বনী সুলায়ম-এর ছাদাক্বা সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছে হিসাব চাইলেন। তখন সে বলল, এগুলো আপনাদের আর এগুলো হাদিয়া, যা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি সত্যবাদী হলে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে বসে থাকলে না কেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর বললেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা থেকে কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতক লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের কেউ এসে বলে এগুলো আপনাদের আর এগুলো হাদিয়া, যা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। সে সত্যবাদী হলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না, যাতে তার হাদিয়া তার নিকট আসে? আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। তা না হলে সে ক্বিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহ্র নিকট হাজির হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চেঁচাতে থাকবে অথবা বকরী নিয়ে আসবে, যে বকরী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি হাত দু'খানা উপরের দিকে এতটুকু উঠালেন যে, আমি তার বগলের শুভ্র উজ্জ্বলতা দেখতে পেলাম এবং বললেন, শুন! আমি কি (আল্লাহ্র বিধান তোমাদের নিকট) পৌছিয়েছি' *(বুখারী হ/৭১৯৭)*।

◈ পরস্পরকে মেনে চলার নেতৃত্ব ব্যবস্থা :

ইসলামী নেতৃত্ব ব্যবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করে। পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে, ঝগড়া-বিবাধ না করে, একে অন্যের বিরোধীতা যেন না করে। কিন্তু প্রচলিত গণতন্ত্রে একে অন্যকে মানতে নারাজ; বরং একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও গ্রম্নপিং করার মাধ্যমে সমাজে বিশৃংখলা তৈরি করে। নিজেদের মধ্যে মারামারি, ঝগড়া, ফাসাদ ও রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরস্পরকে মান্য করতে এবং বিরোধীতা করতে নিষেধ করেছেন। হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) আমার পিতা ও মু'আয ইবনু জাবালকে (রাঃ) ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। তখন তিনি বললেন, يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا 'তোমরা সহজ কর, কঠোর কর না। তাদের সুসংবাদ দাও, ভয় দেখায়ো না এবং পরস্পর পরস্পরকে মেনে চল' *(বুখারী হা/৭১৭২)*।

◈ অন্যায় নেতৃত্বের আনুগত্য :

ইসলাম মানবজাতিকে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছে। আর আমীর ছাড়া জামা'আত হয় না। অসংখ্য হাদীছ দ্বারা তা প্রমাণিত; কিন্তু সেই জামা'আত এবং আমীর অবশ্যই নির্ভেজাল তাওহীদপন্থী হতে হবে। কোন বাতিলপন্থীর সাথে আপোসকামী জামা'আত নয়। যারা দুনিয়া এবং ইসলামের দোহাই দিয়ে দ্বীন ক্বায়েমের পথ হিসাবে ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তাদের সাথে তো নয়। তাছাড়া ঐ জামা'আত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যখন কোন অন্যায়, অসৎ, অসভ্য, অবিচার, অনুচিত, অকর্তব্য, ন্যায়বিরুদ্ধ কর্মের নির্দেশ প্রদান করবে তখন কোন আনুগত্য নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ. 'আমীর যতক্ষণ আল্লাহ্র নাফরমানীর নির্দেশ না দেন, ততক্ষণ পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার আনুগত্য করা কর্তব্য। যখন নাফরামানী কোন কাজের নির্দেশ দিবেন, তখন আর কোন কথা শুনা যাবে না এবং আনুগত্যও চলবে না' *(বুখারী হা/৭১৪৪, ২৯৫৫)*।

অথচ গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতৃত্ব ধর্মের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র নাফরমানী কাজের নির্দেশ প্রদান করছে এবং জনগণ তা মেনে নিচ্ছে। আমাদের মধ্যে ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা যদি থাকত তাহলে হরতাল অবরোধের মত জঘন্য ও নৃশংস প্রথা গ্রহণ করতাম না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেখানে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর আমরা সেখানে রাস্তা অবরোধ করে, হরতাল আহক্ষান করে মানুষকে পুড়িয়ে মারছি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ.

'ঈমানের সত্তরটিরও বেশি শাখা রয়েছে অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে 'আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই' এ কথা স্বীকার করা। সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা

থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা' *(মুসলিম হা/১৬২; মিশকাত হা/৫)*।

অতএব দলীয় যেকোন অসৎ কাজ হতে আমাদের বিরত থাকতে হবে। সেটা গণতন্ত্রের নামে হোক বা ধর্মের নামে হোক। এটা চিরস্থায়ী জাহান্নামের কারণ সমূহের মধ্যে অন্যতম। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠালেন এবং একজন আনছারীকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, নবী করীম (ছাঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি, তোমরা কাঠ সংগ্রহ কর এবং তাতে আগুন জ্বালাও। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন জ্বালাল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কী আমরা (সর্বশেষ) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আমীরের ক্রোধও অপদমিত হয়। এ ঘটনা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ 'যদি তারা তাতে প্রবেশ করত, তাহলে কোন দিন আর এ থেকে বের হত না। জেনে রাখ! আনুগত্য কেবল বৈধ কাজেই হয়ে থাকে' *(বুখারী হা/৭১৪৫, ৪৩৪০; মুসলিম হা/৪৮৭১)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, তারা যদি অন্যায় আদেশ শ্রবণ করত, তাহলে চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের দলর্ভুক্ত হত। এ যুগেও যদি দলের দোহাই দিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে কোন অসৎ কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকি তাহলে আমরাও ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

◈ লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের কেতনতলে মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু :

Might is Right. 'জোড় যার মুল্লক তার'। আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা চালু ছিল। তৎকালীন সমাজকে জাহেলী সমাজ বলা হত। তারা সামান্য একটি বিষয় নিয়ে একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হত। যা বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘায়িত হত। আমাদের মধ্যেও আজ ঐ প্রথা চালু হয়েছে। দলীয় স্বার্থে আমরা গুম, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, রক্তপাত ঘটাতে দ্বিধা করছি না। দলের জন্য লাঠি-বৈঠা, পিস্তল, রামদা, চাপাতি নিয়ে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি। এই সমস্ত দলগুলোর নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নেই। মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, দুনিয়ার ক্ষমতা গ্রাস এবং সাধারণ জনগণের উপর অত্যাচার, দলীয় টেন্ডারবাজী, গুম, খুন ইত্যাদি করা। অথচ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের বাইরে মুসলমানের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাই লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে মৃত্যু হলে তা হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু। লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে জীবন অতিবাহিত করলে সেটা হবে জাহেলিয়াতের জীবন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ব্যাপারে সর্তক করে বলেন,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ .

'যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্র প্রীতির জন্য যুদ্ধ করে অথবা গোত্র প্রীতির দিক আহব্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার থাকে না) আর তাতে সে নিহত হয়, সে জাহেলিয়াতের হালাতে মৃত্যুবরণ করে' *(মুসলিম হা/৪৮৯২)*।

◈ উত্তম নেতৃত্ব ও নিকৃষ্ট নেতৃত্ব :

নেতৃত্বকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তম ও নিকৃষ্ট। উত্তম নেতা সেই, যাকে আমরা ভালবাসব, তারাও আমাদের ভালবাসবে, তারা দো'আ করবে, আমরাও দো'আ করব। জনগণ নেতার জন্য তখনই দো'আ করবে যখন তার উপর অত্যাচার, নির্যাতন, অপবাদ ও তহমত প্রদান করবে না। যখন অত্যাচার নির্যাতন করবে স্বাভাবিকভাবে তখন কর্মীরা নেতাকে খারাপ চোখে দেখবে। তার জন্য অভিশাপ করবে; ফলে নেতাও জনগণের জন্য অভিশাপ করবে, অপবাদ-তোহমত প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালবাস আর তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে। তারা তোমাদের জন্য দো'আ করে, তোমরাও তাদের জন্য দো'আ কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। ছাহাবীগণ তখন বললেন, তাকে বলা হল যে,

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি তাদেরকে তরবারী দ্বারা প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখবে। আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপসন্দনীয় কাজ দেখবে, তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু (তাদের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না' *(মুসলিম হা/৪৯১০)*।

উপসংহার :

নেতৃত্ব এমন একটি বিষয়, যার ফলে মানুষ স্বেচ্ছাচার, হিংস্র ও নৃশংস হয়ে ওঠে। নেতৃত্বের প্রতি লোভের কারণে মানুষ হক্ব থেকে ছিটকে পড়ে। নেতৃত্ব আসনে আসীন হওয়ার জন্য মানুষ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। সত্যকে পরিত্যাগ করে। অন্যদিকে নেতা যদি তাক্বওয়াশীল, দক্ষ, দূরদর্শী, চৌকস ও সুক্ষ্মদর্শী প-িত হন তাহলে সেই সমাজে শান্তি আসবে। অন্যথায় নয়। নের্তৃবৃন্দকে বলব, দয়া করে গুম, খুন, হানাহানি, মারামারি ও রক্তের হোলিখেলা বন্ধ করুন। দেশে শান্তি ফিরে আনার চেষ্টা করুন। ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!!

[লেখক : ৪র্থ বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (ক)

دور الجديد : المرحلة الثانية (الف)

জিহাদ আন্দোলন ১ম পর্যায় শহীদায়েন (রহঃ)

حركة الجهاد للشهيدين

(১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) ৫২ বৎসর

জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন

দীর্ঘ সোয়া পাঁচ বৎসর ব্যাপী হিজরত ও জিহাদের সূচনা হ'তে শেষ পর্যন্ত যে মহান ব্যক্তিটি জিহাদ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবে বিবেচিত ছিলেন, তিনি হলেন দিল্লীর অলিউল্লাহ-পরিবারের আপোষহীণ ব্যক্তিত্ব, 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'র বাস্তব রূপকার, আহলেহাদীছ আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহ্সালার আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল (রহঃ)। বিশ্ববিশ্রুত দাদা, যোগ্যতম পিতা ও পিতৃব্যদের ইল্মের যথার্থ উত্তরাধিকারী আল্লামা ইসমাঈলের ব্যক্তিগত দাওয়াত ও তাবলীগের প্রভাবে যেমন দিল্লীসহ সারা দেশের উপরে ছিল, জিহাদের ময়দানে তেমনি তা মুজাহিদ বাহিনীকে এবং তাদের যাত্রাপথে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর ও তাঁর সাথীদের নিরন্তর দাওয়াত ও তাবলীগে প্রচলিত অন্ধ তাক্বলীদের গোঁড়ামি ক্রমে দূর হতে শুরু করে এবং লোক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি আলো গ্রহণ ও তদানুযায়ী জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই দেখা যায়, হজ্জের সফরে এবং হিজরত ও জিহাদের সফরে যেসব এলাকা দিয়ে তাঁরা গমন করেছিলেন, সেসব এলাকায় আহলেহাদীছ জনগণের সংখ্যা আজও উল্লেখযোগ্য হারে বর্তমান রয়েছে।

শাহ ইসমাঈল ও পাটনার ছাদেকপুরী পরিবারের ন্যায় অন্যান্য আহলেহাদীছ গাযীগণ জিহাদ আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করলেও হানাফী মতাবলম্বী গাযীগণও জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেখানে কোনরূপ বাড়াবাড়ি ছিল না। পারস্পরিক ভালবাসা ও হৃদ্যতা নিয়ে সকলে মিলে মুসলমানের সাধারণ শত্রূ শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আমীরুল মুজাহেদীন সাইয়েদ আহমাদ (রহঃ) ব্যহ্যতঃ হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সমষ্টি 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'-এর মধ্যে স্বীয় মতামত অত্যন্ত ঋজুভাবে সকলের নিকট তুলে ধরে তিনি বলেন, 'সাধারণভাবে যে চার মাযহাবের অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তা সঠিক। কিন্তু নবী (ছাঃ)-এর ইল্মকে কোন নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদ-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ধারণা করা ঠিক নয়। এই জন্য যে, ইল্মে নববী সব একত্রিত হয়ে গেল। এক্ষণে যদি কোন মাসআলায় বিশুদ্ধ, স্পষ্ট এবং গায়র মানসূখ বা হুকুম রহিত নয় এমন হাদীছ পাওয়া যায়, তবে সেক্ষেত্রে কোন মুজতাহিদের অনুসরণ করা চলবে না। মুহাদ্দিছগণকে এ ব্যাপারে অনুসরণীয় গণ্য করতে হবে। তাদের প্রতি মহবক্ষত ও সম্মান প্রদর্শন অত্যন্ত যরূরী। তাঁরা পয়গম্বর (ছাঃ)-এর ইল্মের বাহক। সে হিসাবে এক দিক দিয়ে তাঁরা রাসূলের (ছাঃ) ছাহাবী হবার কারণে রাসূলের পাক দরবারে মকবূল উম্মত হওয়ার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন'।[১০৫]

সৈয়দ আহমাদের উপরোক্ত বক্তব্য আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই যথার্থ প্রতিধক্ষনি। উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী, ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (জন্ম : ১৯১৪ খৃঃ) একারণেই শহীদায়নের (সৈয়দ আহমাদ শহীদ ও ইসমাঈল শহীদ)-কে একত্রিতভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'খালেছ তাওহীদী আক্বীদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, জিহাদী জায্বা এবং আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হওয়া' এই চারটি বুনিয়াদের উপর হিন্দুস্থানে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যান্য দলগুলোর কারো কাছে তাওহীদ আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাতে অলসতা আছে, ইত্তেবায়ে সুন্নাতে জায্বা আছে তো জিহাদী জোশ নেই, কারু কাছে যিক্র ও ফিক্র আছে তো ইত্তেবায়ে সুন্নাত নেই। মূলকথা বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ওগুলোর কোন না কোন একটি নিয়ে উত্থিত হয়েছে। কিন্তু জামা'আতে আহলেহাদীছ-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়ে শহীদায়েনের ছূরতে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে ছাদেকপুরী (আহলেহাদীছ) জামা'আত উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে প্রদর্শন করেছে। তাদের খুলূছিয়াত ও আল্লাহ্র সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সকল সন্দেহের উর্ধ্বে। বাস্তব কথা এই যে, উক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের একত্র সমাহার ব্যতীত বড় কোন অবদান রাখা সম্ভব নয়'।[১০৬]

মাওলানা সুলায়মান নাদভী (১৩০২-১৩৭২/১৮৮৪-১৯৫৩ খৃঃ) আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'আহলেহাদীছ-এর নামে দেশে যে আন্দোলন চলছে বাস্তবে তা নতুন কোন বিষয় নয় বরং পুরনো পদচিহ্নের অনুসরণ মাত্র। মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) যে আন্দোলন নিয়ে উত্থান

---

১০৫. সাইয়িদ আহমাদ শহীদ, 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম'- উর্দূ অনুবাদ : (করাচী-কালাম কোম্পানী, তীর্থদাস রোড, সালবিহীন), পৃঃ ১১৩।

১০৬. মাওলানা আলী নদভী একই ধরণের মন্তব্য করেন বিহারের বিখ্যাত দারাভাঙ্গা দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার বার্ষিক দিস্তারবন্দী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে ১৯৬১ সালের ১৬ই জুলাইতে ও ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে, যা যথাক্রমে 'আল-হুদা' দারাভাঙ্গা এবং নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্ণৌ-এর মুখপত্র পাক্ষিক 'তা'মীর মিল্লাত' ২৫শে মে ১৯৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। -হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, 'তাহরীক জিহাদ' (গুজরানওয়ালা-পাকিস্তান : নাদওয়াতুল মুহাদ্দেছীন, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬), পৃঃ ৪৯-৫০।

করেছিলন, তা ফিক্হের কয়েকটি মাসআলা মাত্র ছিল না বরং ইমামতে কুব্রা, খালেছ তাওহীদ এবং ইত্তেবায়ে নববীর বুনিয়াদী শিক্ষার উপরে ভিত্তিশীল ছিল। ..... এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তা হ'ল ইত্তেবায়ে নববীর যে জায্বা হারিয়ে গিয়েছিল, তা বছরের পর বছরের জন্য পুনরায় সৃষ্টি হয়েছে। জিহাদের যে আগুন ঠা-া হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় জ্বলে উঠেছে। এমনকি এমন একটা সময় গিয়েছে, যখন 'ওয়াহ্হাবী ও বিদ্রোহী' প্রতিশব্দ হিসাবে বলা হ'ত। কতজনের মাথা কাটা হয়েছে, কতজনকে শূলে চড়ানো হয়েছে, কতজনকে দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছে, কতজনকে কয়েদখানার অন্ধ কুঠরীতে দম বন্ধ করে মারা হয়েছে, তার ইয়ত্তা কোথায়?'[১০৭]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন, 'হিন্দুস্থানে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হতে ওয়াহ্হাবীদেরকে একটি ভয়ংকর রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, এই জামা'আতটিকে ইসমাঈল শহীদ প্রতিষ্ঠিত জামা'আত মনে করা হ'ত। যিনি জিহাদের উপরে এই আন্দোলনের বুনিয়াদ রচনা করেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে বাস্তবে জিহাদ করেছিলেন। মাওলানা শহীদের পরে মাওলানা ছাদেকপুরীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয় এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। .... এইসব কারণে কাউকে 'ওয়াহ্হাবী' সন্দেহ করলেই বৃটিশ সরকার তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেফতার করত এবং মিথ্যা মামলা, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত প্রভৃতি শাস্তি তাদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছিল। এই জামা'আতের শত শত আলিম ও ধনী ব্যবসায়ীকে কালাপানিতে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। .... প্রসিদ্ধ ওয়াহ্হাবী মামলা সমূহ ও ছাদেকপুরী পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতি সমূহ এই জামা'আতেরই একক কৃতিত্ব।'[১০৮]

ড. কিউ আহমাদ বলেন, 'একটি ক্ষমতাধর বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অর্ধশতাব্দীকাল অবধি ব্যাপক লড়াইয়ে নেতৃত্বদানের সার্বিক বোঝা বাস্তবিকপক্ষে এই (ছাদিকপুরী) পরিবারের উপরের ন্যস্ত ছিল। স্বদেশীদের নিকট থেকে সাহায্য কামনা দূরে থাক, অবদানের স্বীকৃতিটুকুও তারা কখনও কামনা করেনি'।[১০৯]

জীবনীকার মিরযা দেহলভী বলেন, 'মাওলানা শহীদের আন্তরিক কামনা ছিল যে, মুসলমান যাবতীয় মাযহাবী গোঁড়ামী ভুলে নিরপেক্ষভাবে পূর্ণ উদ্দীপনায় কুরআন ও হাদীছের হুকুম অনুযায়ী জীবন-যাপান করুক।.... মুসলমান নিজেকে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী না বলে বরং রাসূলের দিকে সম্বন্ধ করে নিজেকে 'মুহাম্মাদী' বলুক। প্রিয় শহীদের অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, তিনি লক্ষ লক্ষ মুমিনের মুখ দিয়ে একথা গর্বের সাথে বলাতে পেরেছিলেন যে, 'আমরা মুহাম্মাদী'।[১১০]

এস. বি. চৌধুরী বলেন, 'সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার ফলে ঢাকা হ'তে পেশোয়ার পর্যন্ত দেশের সকল প্রান্ত থেকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্যাদি প্রাপ্ত হয়ে ওয়াহ্হাবী আন্দোলন তার শিকড় মযবুত করে নেয়। একথা মানতেই হবে যে, বৃটিশ সরকার এদেশে যতগুলো আন্দোলন জন্ম দিয়েছে, তন্মধ্যে ওয়াহ্হাবী আন্দোলনই সর্বাপেক্ষা কঠোর ও রূঢ় ইংরেজ ছিল। তাদের সকল চেষ্টা-সাধনায় তারা এর স্বাক্ষর রেখেছে।'[১১১]

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ আন্দোলনে প্রথম নেতৃত্ব ছিল শহীদায়েনের হাতে এবং পরবর্তী নেতৃত্ব ছিল পাটনার ছাদিকপুরী আহলেহাদীছ পরিবারের হাতে।

আল্লামা শাহ ইসমাঈল ও মাওলানা বেলায়েত আলীকে 'হানাফী' হিসাবে কেউ কেউ আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন।[১১২] কিন্তু আল্লামা ইসমাঈল-এর আমল ও লেখনীসমূহ এবং মাওলানা বেলায়েত আলীর বিশেষ করে 'আমল বিল-হাদীছ' পুস্তিকাটি পাঠ করলেই তাঁদের আকীদা ও আমল স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। দারুল উলূম দেউবন্দের শিক্ষক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধু হানাফী বলেন, 'পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী বালাকোট যুদ্ধে হাযির ছিলেন না। তিনি আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সেই জামা'আতের একজন স্তম্ভ ছিলেন, যে জামা'আতটি আল্লামা শহীদ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' পাঠ করার পর তার উপর বাস্তবে আমলকারী হিসাবে বানিয়েছিলেন। এই জামা'আতের লোকেরা ছালাতে রাফ্উল ইয়াদায়েন ও সরবে 'আমীন' বলতেন'।[১১৩] মাওলানা সিন্ধীর উপরোক্ত বক্তব্যে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লামা শহীদ ও মাওলানা বেলায়েত আলী ছাদিকপুরী সেই জামা'আতের অনুসারী ছিলেন, যাঁরা সশব্দে আমীন ও রাফ্উল ইয়াদায়েনে অভ্যস্ত ছিলেন। স্বয়ং মাওলানা বেলায়েত আলী স্বীয় পুস্তিকা 'রিসালায়ে দাওয়াত'-এর মধ্যে নিজের জামা'আতকে 'মুহাম্মাদী' বলে উল্লেখ করেছেন। *[ক্রমশ]*

[লেখক : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৫৯-২৬৪]

১০৭. নওশাহরাবী, 'তারাজিম'-ভূমিকা, পৃঃ ৩১।

১০৮. ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, 'তাহরীকে জিহাদ', পৃঃ ৫০-৫১; কলিকাতা ও এলাহাবাদের চীফকোর্ট, হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে ওয়াহ্হাবীদে পক্ষে রায়প্রাপ্ত মামলা সমূহের বিরবণ সংকলিত হয়েছে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৮৬৮-১৯৪৮) প্রণীত 'ফুতূহাতে আহলেহাদীছ' বইয়ের মধ্যে। প্রকাশক : মাকতাবা শু'আইব, হাদীছ মনযিল, করাচী-১, ১৯৬০ খৃঃ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা -৮০।

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩।

১১০. মিরযা, 'হায়াতে ত্বাইয়িবাহ', পৃঃ ৩৪৮-৪৯।

১১১. তাহকীক, পৃঃ ৫৩-৫৪।

১১২. নাযীর আহমাদ রহমানী, 'আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত' (বেনারস : জামেয়া সালফিইয়াহ, ১৯৮৫) পৃঃ ৬৪, ২১০-২৩০।

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ

রাজশাহীর অভিভাষণ

[বাংলা ১৩৫৫ সাল ২৮শে ফাল্গুন মোতাবেক ১৯৪৯ ইং ১২ মার্চ তারীখে রাজশাহীর উপকণ্ঠ নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্সে তৎকালীন 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত অভিভাষণ]

(৩য় কিস্তি)

শায়খুল ইসলাম সৈয়দ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছের বিশাল ছাত্র বাহিনীর তালিকা প্রদান করা কোন অভিভাষণের ভিতর সম্ভবপর নয়। মোটামুটিভাবে হিন্দের প্রসিদ্ধ ছাত্র ম-লীর কতিপয় নাম প্রদান করিতেছি : (১) আল্লামা হাকিম আলীমুদ্দীন হুসাইন নগর নহসবী (২) মাওলানা নাযির হুসাইন বিহারী (৩) 'আওনুল মা'বূদের রচয়িতা আল্লামা আবুত্ব ত্বাইয়েব শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (৪) মাওলানা তালাম্ভফ হুসাইন বিহারী (৫) মাওলানা শাহ আয়নুল হক ফুলওয়ারী (৬) মাওলানা আলী নে'মত (৭) মাওলানা সুলায়মান ফুলওয়ারী (৮) মাওলানা সা'আদত হুসাইন বিহারী (৯) মাওলানা হাফিয আব্দুল্লাহ সাপরাতী (১০) মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী (১১) মাওলানা আব্দুন নূর দ্বারভাঙ্গাবী (১২) তুহ্‌ফাতুল হিন্দের রচয়িতা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ (১৩) মাওলানা হাফিয আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নাবীনা (১৪) মাওলানা আব্দুল্লাহ গয্‌নভী (-১২৯৮) (১৫) মাওলানা আব্দুল জাবক্ষার গয্‌নভী (১৬) মাওলানা আবুল ওয়াফা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (-১৩৬৭) (১৭) কাযী তিলা মুহাম্মাদ পেশাওয়ারী (-১৩১০) (১৮) মাওলানা বশীর সাহসওয়ানী (-১৩২৬) (১৯) মাওলানা আব্দুল হক্ব হক্কানী দেহলভী (২০) শাসসুল ওলামা ডিপুটি নাযির আহমাদ (২১) মাওলানা হাফীযুল্লাহ খান দেহলভী (১৩২৪) (২২) মাওলানা আব্দুর রব দেহলভী (২৩) হাকিম আজমল খাঁর পিতা হাকিম আব্দুল মজীদ দেহলভী (২৪) মাওলানা ইবরাহীম সিয়ালকোটী (২৫) মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী (২৬) মাওলানা আব্দুল মান্নান উযিরাবাদী (২৭) মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন হাযারভী (২৮) মাওলানা ইউসুফ হুসাইন খানপুরী (২৯) মাওলানা হাফীযুল্লাহ আজমগড়ী (৩০) মাওলানা সালামতুল্লাহ জয়রাজপুরী (৩১) মাওলানা আবুল মা'আলী মুহাম্মাদ আলী আজমগড়ী (৩২) মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসীর পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসী (-১৩২২) (৩৩) মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ টোঁকী (৩৪) আমীর সৈয়দ আহমাদের দৌহিত্র সৈয়দ মুহাম্মাদ ইরফান (৩৫) মাওলানা আবু ইয়াহইয়া শাহজাহানপুরী (৩৬) মাওলানা হাফিয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (-১৩২২) (৩৭) মাওলানা আব্দুল হালীম শরর লক্ষ্ণৌভী (-১৩৪৫) (৩৮) তিরমিযীর অনুবাদক মাওলানা বদীউয্‌যামান (৩৯) কুতুবুস সিত্তাহ্‌র অনুবাদক মাওলানা ওহীদুয্‌যামান (৪০) হেদায়ার অনুবাদক মাওলানা সৈয়দ আমীর আলী (৪১) মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ আনছারী মিসলিশহরী (-১৩৩০) (৪২) মাওলানা আব্দুল জাবক্ষার উমরপুরী (৪৩) মাওলানা ইবরাহীম আরাবী (৪৪) 'আহসানুত তাফসীর' সঙ্কলয়িতা ডেপুটি সৈয়দ আহমাদ হাসান (-১৩৩৮) (৪৫) তিরমিযীর ব্যাখ্যাকার মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (-১৩৫৩)।

আল্লামা সৈয়দ নাযীর হুসাইন বাংলা ১২৯২ সালে বাঙ্গালা পরিভ্রমণকল্পে এদেশে আগমন করেন। মুর্শিদাবাদের দেবকু-, রংপুরের লালবাড়ী ও রামদেব, রাজশাহীর জামিরা, যোগীপাড়া প্রভৃতি স্থান সেই সময় তাঁহার পাদস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল। সৈয়দ ছাহেবের বাঙ্গালী ও আসামী ছাত্রবৃন্দের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহা পুরাপুরিভাবেই উল্লেখ করিতেছি :

(৪৬) আল্লামা মুহাম্মাদ বিন যিল্লুর রহীম মঙ্গলকোটী (৪৭) মাওলানা তালেবুর রহমান অর্জ্জুনা (৪৮) মাওলানা ফযলে করীম (৪৯) মাওলানা নে'আমাতুল্লাহ (বর্ধমান) (৫০) মাওলানা আব্দুল বারী (৫১) মাওলানা ইফাযুদ্দীন (৫২) মাওলানা আয়েনুদ্দীন (৫৩) মাওলানা রহীম বখ্‌শ (২৪ পরগনা) (৫৪) মাওলানা আব্দুল লতীফ (হুগলী) (৫৫) মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক্ব (৫৬) মাওলানা মাযহারুল হান্নান (৫৭) মাওলানা আহমাদ (৫৮) মাওলানা আয়েনুদ্দীন (৫৯) মাওলানা ইয়াহইয়া (৬০) মাওলানা আব্দুর রহমান (৬১) মাওলানা নাছীরুদ্দীন (৬২) মাওলানা আব্দুল গণী (৬৩) মাওলানা গোলাম রহমান (৬৪) মাওলানা তোরাব আলী (খাকীশাহ নদীয়া) (৬৫) মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম খলীল দেবকু-ী (৬৬) মাওলানা হেফাযতুল্লাহ (৬৭) মাওলানা সালীমুদ্দীন (৬৮) মাওলানা আব্দুল আযীয (৬৯) মাওলানা নাজমুদ্দীন (৭০) মাওলানা ইয়াকুব (মুর্শিদাবাদ) (৭১) মাওলানা ইনায়াতুল্লাহ (৭২) মাওলানা মাওলা বখ্‌শ (৭৩) মাওলানা আব্দুল হাকীম (৭৪) মাওলানা আমানতুল্লাহ (৭৫) মাওলানা মুফতী আব্দুল করীম (৭৬) মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (৭৭) মাওলানা আবু মুহাম্মাদ ইবরাহীম (মালদহ) (৭৮) মাওলানা মুহাম্মাদ (বাং-১৩২৪) (৭৯) মাওলানা ইসহাক্ব (১৩০৬) (৮০) মাওলানা আহমাদ (-১৩১১) (৮১) মাওলানা রহীম বখ্‌শ (-১৩২১) (৮২) মাওলানা আছগর আলী (-১৩০৩) (৮৩) মাওলানা মাওলায় (৮৪) মাওলানা নাছীরুদ্দীন (বাং-১২৯৯) (৮৫) মাওলানা শরী'আতুল্লাহ বাদড়ীয়া (৮৬) মাওলানা আব্দুল আযীয (৮৭) মাওলানা নাছীরুদ্দীন (৮৮) মাওলানা কাদের বখ্‌শ (৮৯) মাওলানা ইসমাঈল (৯০) মাওলানা কফীলুদ্দীন (৯১) মাওলানা সুলায়মান (রাজশাহী) (৯২) মাওলানা সায়ফুল্লাহ (৯৩) মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন (বগুড়া) (৯৪) মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী (৯৫) মাওলানা আব্দুল বাছেত (৯৬) মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা (৯৭) মাওলানা আব্দুল হামীদ (৯৮) মাওলানা আমানতুল্লাহ (৯৯) মাওলানা আব্দুল গফুর (১০০) মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন (১০১) মাওলানা বশীরুদ্দীন (১০২) মাওলানা আমীরুদ্দীন (১০৩) মাওলানা রিসালুদ্দীন (১০৪) মাওলনা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (১০৫) মাওলানা ইসহাক্ব (১০৬) মাওলানা সুলায়মান (১০৭) মাওলানা যামীরুদ্দীন (১০৮) মাওলানা খায়েরুদ্দীন (১০৯) মাওলানা ওবায়দুল আকবর (১১০) মাওলানা ইবরাহীম (১১১) মাওলানা আতীকুর রহমান (দিনাজপুর) (১১২) মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (১১৩) মাওলানা আতাউল্লাহ (১১৪) মাওলানা শরী'আতুল্লাহ (১১৫) মাওলানা খিযরুদ্দীন (১১৬) মাওলানা বেশারতুল্লাহ (১১৭) মাওলানা আমানতুল্লাহ (১১৮) মাওলানা

আব্দুস সালাম (রংপুর) (১১৯) মাওলানা দাবীরুদ্দীন আব্দুর রহমান (পাবনা) (১২০) মাওলানা যিল্লুর রহীম আকবর হুসাইন (১২১) মাওলানা খলীলুর রহমান (১২২) মাওলানা হামীদুর রহমান (১২৩) মাওলানা আব্দুর রহমান কান্দাহারী (১২৪) মাওলানা আব্দুস সালাম (১২৫) মাওলানা আবব্বাস আলী (১২৬) মাওলানা আব্দুছ ছবুর (১২৭) মাওলানা মুহাম্মাদ ইলাহী বখ্শ (১২৮) মাওলানা ইসহাক্ব (১২৯) মাওলানা আব্দুল হাকীম (১৩০) মাওলানা আব্দুল গফূর (১৩১) মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস (১৩২) মাওলানা সৈয়দ খাওয়াজা আহমাদ (ময়মনসিংহ) (১৩৩) মোল্লা মুহাম্মাদ আরীফ (১৩৪) মাওলানা মানছুরুর রহমান (১৩৫) মাওলানা নাছীরুদ্দীন (১৩৬) মাওলানা আব্দুল্লাহ (১৩৭) মাওলানা ইবরাহীম (১৩৮) মাওলানা হায়দার আলী (ঢাকা) (১৩৯) মাওলানা হায়দার আলী (১৪০) মাওলানা আসাদ আলী (১৪১) মাওলানা বখশী আলী (১৪২) মাওলানা হুসনুয্যামান (১৪৩) মাওলানা আব্দুল ফাত্তাহ (১৪৪) মাওলানা বখশিশ আলী (১৪৫) মাওলানা মনীরুদ্দীন (চট্টগ্রাম) (১৪৬) মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের (১৪৭) মাওলানা হাসান আলী (১৪৮) মাওলানা আব্দুল বারী (১৪৯) মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব (১৫০) মাওলানা ওবায়দুল্লাহ (শ্রিহট্ট) (১৫১) মাওলানা সা'আদুল্লাহ (আসাম) (১৫২) মাওলানা উযায়রুদ্দীন (কাছাড়) (১৫৩) মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর (১৫৪) মাওলানা আমীরুদ্দীন (ব্রহ্মদেশ) (১৫৫, ১৫৬, ১৫৭) মাওলানা শামসুল হক্ব আজিমাবাদীর উল্লিখিত ৩ জন আলীম (তিবক্ষত, চীন)।

কাবুল, গযনী, বাজুর, ইয়াগিস্তান, বুখারা, সমরকন্দ, কাশগর, হিরাৎ, হাবশান দ্বীপ, হেজায, ছমরুদ, সিন্নোস ও নজদের ছাত্র ম-লীর তালিকা শায়খের জীবনীতে উল্লিখিত আছে। অনাবশ্যক বোধ করায় পরিত্যক্ত হইল।

বাঙ্গালা ও আসামের যে তালিকা আমি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার সংখ্যা অপেক্ষা যে সকল নাম সংগৃহীত হয় নাই সেগুলির সংখ্যাই বেশী হইবে, কিন্তু শায়খুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বোধ হয় কেহ বাদ পড়েন নাই। এই তালিকা এবং আন্দোলনের সক্রিয় অংশে যোগদানকারীদের তালিকা সংগ্রহ আমাকে প্রায় দুই বৎসর কাল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আমার উদ্দেশ্য বন্ধু-বান্ধব এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে তালিকাভুক্ত ও তালিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য উৎসাহিত করা। কারণ এই অনুসন্ধান সঠিকভাবে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গালার **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে, এই আন্দোলন সম্পর্কে বাঙ্গালার সেবা ও দানকে আমাদের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লেখকগণ বড়ই উপেক্ষা করিয়াছেন এবং ক্ষাত্র বল ও ইলমী যোগ্যতাকে আজো উপহাস করা হইতেছে। সুতরাং **আহলেহাদীছ আন্দোলন** তথা হিন্দ ও বাঙ্গালার সর্বশেষ অবিমিশ্র ইসলামী আন্দোলনের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের কার্য আমাদিগকেই সম্পন্ন করিতে হইবে

دادیم ترا ارگنج مقصود نشان

گرما نرسیدیم تو شاهد برسي!

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, আল্লামা শাহ ইসহাক্ব দেহলভীর হিজরতের এবং কুতুবুল ইসলাম মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের হিজরত ও মাওলানা বেলায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের ইনতিক্বালের পর দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ভাঙ্গন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দিল্লীর সৈয়দ নাযীর হুসাইনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অতঃপর সীমান্তের 'স্থানা' ক্যাম্পের যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া যায়, ক্যাম্প হইতে প্রত্যাগত বহু গাযী তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ক্রমে ক্রমে আন্দোলন দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এ ক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দের মুসলিমগণ যখন প্রাণপাত করিয়াছিলেন এবং মাওলানা আহমাদুল্লাহ শাহ, মাওলানা ফযলে হক্ব খয়েরাবাদী, নাওয়াব মুছত্বফা খান দেহলভী, মুফতী সদরুদ্দীন খান দেহলভী, সৈয়দ আকবারুয্যামান আকবর আবাদী, মাওলানা পীর আলী পাটনাভী, মাওলানা ফয়েযুল্লাহ দেহলভী, মাওলানা ইমাম বখ্শ সহবায়ী, শাহ আহআদ সারীদ, মাওলানা জালালুদ্দীন বেনারসী, মাওলানা শাহ আব্দুল জলীল আলীগড়ী প্রভৃতি আলেমগণ এই সংগ্রামে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সীমান্তের 'স্থানা' কেন্দ্রে মাওলানা বেলায়েত আলী ছাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু হিন্দের উল্লিখিত বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সম্বন্ধে ইতিহাসের কোন সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই; তবে ১৮৫০ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমান্তের ক্যাম্পে তাহারা যে নীরব ছিলেন না, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। এ সময়ের ভিতর হিন্দের ব্রিটিশ রাজ শক্তিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ৩৬ টি অভিযান (Expedition) পরিচালিত করিতে হইয়ছিল।

মোটকথা, মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেবের সময় হইতে **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর সর্বভারতীয় ব্যাপক রূপ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং আন্দোলনের গতি মন্থর, একদেশদর্শি ও ভঙ্গ প্রবণ হইতে থাকে। যদি এই অবস্থা না ঘটিত এবং আমীর সৈয়দ আহমাদ, শাহ ইসমাঈল ও শাহ ইসহাক্বের যুগের ন্যায় পরবর্তী কালেও আহলেহাদীছগণ সক্রিয় ও ইলমী যোগসূত্রে দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিত এবং একদেশদর্শিতার রোগ প্রবেশ না করিত তাহা হইলে আজ হিন্দ ভূমিতে শাহ ওলীউল্লাহ, শাহ আব্দুল আযীয ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর স্বপ্ন যে বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করিত তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ অলিউল্লাহকে হিন্দে **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর তৃতীয় পর্যায়ের ইমাম বলা যাইতে পারে। কুরআন ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি আন্দোলনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন :

(১) খিলাফতে রাশিদার আদর্শানুসারে হিন্দে ইসলামী রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

(২) শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও মাযহাবী দলাদলীর অবসান ঘটাইয়া হিন্দের বুকে এক ও অখ- অবিমিশ্র মুসলিম জামা'আত ক্বায়েম করা।

(৩) ইবাদত, রাষ্ট্র, তামুদ্দুন, অর্থনীতি ও দৈনন্দিন আচরণ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্দেশাবলীর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ।

শাহ অলিউল্লাহ যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন দিল্লীর সিংহাসনে মোগল গৌরব আওরঙ্গযেব আলমগীর (রহঃ) অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাহ ছাহেবের চারি বৎসর বয়সে ১১১৮ হিজরীর ২৮ শে যিলক্বাদ তারিখে আলমগীর পরলোকগমন করেন। আকবরী বিদ'আতের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ আলফুছ ছানীর উত্থান করার ফলে শাহজাহান ও আওরঙ্গযেবের অবস্থা বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়ছিল। হিন্দ ভূমিতে হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, হানাফী ফিকহের চর্চা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আলমগীরের মৃত্যুর সংগে সংগে মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিম জাতীয়তা পুনরায় বিপন্ন হয়। মোগল সম্রাটগণের

হিন্দুপ্রীতির সংগে সংগে শী'আ প্রীতির ভাবও অতিশয় প্রবল ছিল। মন্ত্রীগণ প্রায় সকলেই শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন। নূরজাহান তদীয় পিতা ও ভ্রাতার কল্যাণে শী'আগণ মোগল রাজত্বের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে, আওরঙ্গযেবের মৃত্যুর মাত্র চারি বৎসর পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ আলম বাহাদুর শাহ মু'আয্যাম ১১২২ হিজীর রবীউল আউওয়াল মাসে প্রকাশ্যভাবে শী'আ মতে দীক্ষিত হন। তখন হইতে হিন্দ ও বাঙ্গালার প্রতি জনপদে শী'আ মাযহাব শিকড় গাড়িয়া বসিতে আরম্ভ করে। হানাফীগণ বাহাদুর শাহের নিধন কামনায় দো'আ ও খতম পড়িতে লাগিয়া যান এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সুন্নী আলেমগণের সহিত শী'আদের তর্ক-বিতর্ক ও বচসা চলিতে থাকে।

বর্ণিত শী'আ ও সুন্নী সংঘর্ষ উত্তরকালে বাগদাদের ন্যায় হিন্দ ভূমি হইতে ইসলামী রাজত্বের বিলুপ্তির অন্যতম কারণ পরিণত হইয়াছিল। হিন্দুরা আবার সর্বত্র মস্তক উন্নত করিতে লাগিয়া গিয়াছিল ইংরেজদের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছিল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শাহ ওলীউল্লাহ ছাহেবের বয়স যখন ৫৫ বৎসর তখন পলাশীর প্রলয়কা- সংঘটিত হইল।

মারহাট্টি পেশওয়া রাজবংশের স্রষ্টা ও শিবাজীর পৌত্র শাহুজীর আশ্রয়দাতা এবং সাহায্যকারী বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র বাজীরাও ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে গুজরাটে পেশওয়া রাজবংশ স্থাপন করেন। হেলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা প্রভৃতি তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কর্ণাটকে দোস্ত মুহাম্মাদ খানকে পরাস্ত করেন, ত্রিচিনা পল্লীও তাঁহাদের হস্তগত হয়। তাঁহারা ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে আসফজাহী (নিযাম) রাজ্যের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মোগল সম্রাজ্যের উত্তরাংশে লুটতরাজ আরম্ভ করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে নর্বদা নদী অতিক্রম করিয়া মালওয়া লুট করেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসী রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দখল করিয়া লন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে গয়া, মথুরা, কাশী ও ইলাহাবাদ অধিকার করিয়া বসেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও এর মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র বালাজীলাও পিতার স্থান অধিকার করেন তদীয় ভ্রাতা রঘুনাথ রাও রাঘবা নাম ধারণ করিয়া দিল্লী প্রবেশ করেন এবং দাতাজী সিন্ধিয় এবং রাও হোলকারের নেতৃত্বে দুইটি সেনাবাহিনী রাখিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান। বালাজীর জ্ঞাতিভ্রাতা সদাশিবরাও ৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর রাজ প্রাসাদের কদমে রসূল ও নিযামুদ্দীন আওলিয়ার মাযারে এবং মুহাম্মাদ শাহের মকবরায় যত স্বর্ণখচিত কারুকার্য্য ছিল, সমস্তই উপড়াইয়া লন; এমন কী স্বর্ণ শামাদান ও ধুপদানী পর্যন্ত গলাইয়া লওয়া হয়।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ হিন্দু রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা লক্ষ্য করিয়া হতবুদ্ধি হন নাই। নাওয়াব নজীবুদ্দৌলা ও হাফেয রহমত খান শাহ ছাহেবের ভক্ত ও একান্ত অনুগত ছিলেন এবং শাহ ছাহেবের প্রচেষ্টা ও সৎপরামর্শের ফলেই সফদর জংগের পুত্র শুজাউদ্দৌলাকে সম্মত করিয়া নজীবুদ্দৌলা সা'আদুল্লাহ খান আহমাদ খান বঙ্গশ, হাফেয রহমত খান ও দুন্দি খান আহমাদ শাহ আব্দালীকে দিল্লীতে আহব্বান করেন। ফলে পানিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং হিন্দুস্থানে ব্রাক্ষ্মতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং হিন্দু রাজ স্থাপনের পরিকল্পনা দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়া যায়।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে শিখ আলাজাট সারহিন্দে ২ লক্ষ সৈন্য সমাবেশিত করিয়া দিল্লী আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল এবং সমস্ত দেশে তাহারা অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছিল। নাজীবুদ্দৌলার আহব্বানে পুনরায় আহমাদ শাহ আব্দালী লাহোর প্রবেশ করেন। আর শিখরা পলায়ন করিয়া পর্বতে আশ্রয় লয়। আহমাদ শাহ আব্দালী দুই দিনে ১০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সারহিন্দে উপস্থিত হইয় আলাজাটকে আক্রমণ করেন। আলাজাট পরাভূত এবং তাহার ২ হাযার সৈন্য রণক্ষেত্রে নিহত হয়।

কিন্তু শাহ অলিউল্লাহ তাঁহার প্রখর জ্ঞান গরীমা ও প্রদীপ্ত প্রতিভা বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শুধু বাহিরের সাহায্যের উপর ভরসা করিলে হিন্দ ভূমিতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে না। মুসলমানদের জাতীয় জীবনে যে অবসাদ ও অভিশাপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে তাহার আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে এবং মোগল রাজ্যের আসন্ন পতনের যুগসন্ধিক্ষণে অবিমিশ্র ইসলামী রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সংস্কার ও স্বাধীনতার যে কার্যসূচী তিনি তাঁহার গ্রন্থরাজিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। তদীয় সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আযীযের সময়ে সেগুলিকে বাস্তবতার রূপ প্রদান করার চেষ্টা করা হয় এবং শাহ অলিউল্লাহ্‌র পৌত্র শাহ ইসমাঈল এবং দৌহিত্র শাহ ইসহাক্ব এই সাধনায় তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করেন।

کشتگا خنجر تسلیم وا

ہر زمان از غیب جالي دیگر است !

পিতা, পুত্র ও পৌত্রদের এই কর্ম সাধনাই হিন্দ ও বাংলায় 'ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলন' নামে সুখ্যাত বা কুখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ছাড়া ইহার অপর কোন নাম নাই। আমি এই আন্দোলনের কতটা বিস্তৃত ইতিহাস স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং তাহার কিয়দাংশ আহলেহাদীছ কনফারেন্সের রংপুর হারাগাছ ও পাবনা অধিবেশনে বন্ধুবর্গকে শুনাইয়াছি; সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ ভাংগন, সিপাহী সংগ্রামের শোচনীয় পরিণতি ও পরবর্তী ওয়াহ্‌হাবী ধরপাকড়ের ফলে যখন নেতা ও কর্মীগণ সর্বত্র ধৃত, অত্যাচারিত, শুলদ- দ-িত, মুক্ত তরবারীর সাহায্যে নিহত, ভস্মীভূত, যাবজ্জীবন কালাপানিতে প্রেরিত এবং আন্দোলন সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের ভূসম্পত্তি লুণ্ঠিত ও বাজেয়াপ্ত হইল তখন হইতে **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর গতি শুধু বাহাছ ও বক্তৃতামুখী হইয়া পড়িল; ক্রমে ক্রমে আন্দোলনের বিরাট লক্ষ্য ও সমুন্নত আদর্শের কথা বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইল। বর্তমানে **আহলেহাদীছ আন্দোলন** আন্দোলনের পরিবর্তে একটি ফের্কায় পরিণত হইয়াছে এবং এই জামা'আতের যে কিছু করণীয় বা ইহার অস্তিত্বের যে কোন প্রয়োজন আছে তাহা অনুমান করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও হিন্দের দুই প্রান্তে আল্লাহ্‌র অপরিসীম ফযল ও অনুকম্পায় ইসলামের Home Land স্থাপিত হইয়াছে। আহলেহাদীছগণ দাওলাতে খোদাদাদ পাকিস্তানে কোন স্বাতন্ত্র দাবী করে না। তাহারা চায় এই রাষ্ট্রে শুধু আল্লাহ্‌র অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ আল্লাহ্‌র খলীফারূপে আল্লাহ্‌র বিধান ও শরী'আতকে বলবৎ করুন। মুজাদ্দিদে আলফুছ ছানী ও শাহ ওলীউল্লাহ্‌র স্বপ্ন সফল হইক। যে ইলাহী রাজ্য গঠন করার সাধনায় আমীর সৈয়দ আহমাদ ও মুজাদ্দিদ ইসমাঈল অর্ধেক পাঞ্জাবের রাজত্বের সন্ধি শর্তকে পদাঘাত করিয়া মুসলিম জাতির জন্য আপন মস্তক দান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সে সাধনা জয়যুক্ত হইক।

রাজ্য ও স্বাধীনতার নে'মত মুসলমানদিগকে আল্লাহ এই জন্যই দান করিয়াছেন যে, তিনি দেখিতে চান আমরা তাঁহার কালেমার গৌরবের জন্য কিরূপ আচরণ করি।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ- (ألانعام-١٦٥)

শারঈ শাসন বলবৎ করার জন্য আজ পাকিস্তানের মুসলমানগণ দিকে দিকে আর্তনাদ করিতেছেন। 'জমঈয়তে ওলামায়ে ইসলাম'-এর সভাপতি মাওলানা সাবিব্বর আহমাদ ওছমানী মুসলমানগণের এই দাবীকে সার্থক করার নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানগণের উল্লিখিত আকাঙ্খা দাবীর রূপ ধারণ করার বহু পূর্বে আমি আমার দুর্বলতা ও অক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকা সত্ত্বেও 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ'-এর নগণ্য খাদেম হিসাবে 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র' রূপে পাকিস্তানে শারঈ শাসন প্রবর্তন করার দাবী পুস্তকাকারে প্রকাশ করি এবং সকল দলের ওলামা, পীর ছাহেবান, নেতৃম-লী এবং গণ পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিকট উহা পাঠাই। দুই চারিজন বিশিষ্ট ছাড়া অধিকাংশ লোক আমার প্রস্তাবকে তখন অচল ও দুঃস্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ, আজ সেই দুঃস্বপ্ন জাতির মানস লোকের প্রধান ও প্রিয়তম কাম্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

فا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله.

কোন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন প্রচলিত নাই বলিয়া এই দাবী উড়াইয়া দিলে চলিবে না। পাকিস্তান যেভাবে অর্জিত হইয়াছে, অধিকন্তু পাক-ভারত যেভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে দুনিয়াতে তাহার কোন নযীর আছে কি? রুশের কম্যুনিযমেরও কোন নযীর নাই। কিন্তু পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে, পাক-ভারত ইংরেজের শাসনতান্ত্রিক গোলামী হইতে নাজাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং রুশেও কম্যুনিষ্টিক স্টেট গঠিত হইয়াছে এবং বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। অথচ ইসলামী হুকুমতের নযীর আছে, তাহার সাফল্য ও সার্থকতা রূপ কথা নয়, ঐতিহাসিক সত্য।

পাকিস্তানে কম্যুনিযম শিকড় গাড়িতে পারে নাই। কিন্তু তার চেষ্টায় আছে ব্রহ্ম ও চীন বিজয়ের পর ইহার পাকিস্তানমুখী হওয়া অনিবার্য। ভারত সাম্রাজ্যের তোরণ অতিক্রম করিয়া সে তাহার বুকে হানা দিয়াছে। শুধু রুদ্র আইনের প্রয়োগ এবং বেআইনী অর্ডিন্যান্স সমূহ বলবৎ করিয়া কোন আন্দোলনের গতিরোধ করা সম্ভবপর নয়। একমাত্র সত্যিকার ইসলামী হুকুমত কম্যুনিযমের প্ররিরোধ করিতে সমর্থ। যদি বাস্তবিক তথাকথিত সমানাধিকারবাদ অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে শারঈ-শাসন বলবৎ করিতেই হইবে। আমি এরূপ কথা বলিতেছি না যে, শরী'আতের প্রত্যেকটি ধারা অবিলম্বে বলবৎ করা হউক। আমরা চাই-ইসলামী রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র আল্লাহ্র সর্বময় প্রভুত্ব (Paramountoy) পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বীকৃত হউক, শরী'আত বিরুদ্ধ আইন বিধিবদ্ধ হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হউক এবং যাহা সর্বসম্মত হারাম ও নিষিদ্ধ, তাহা অবিলম্বে রহিত করিয়া দেওয়া হউক।

সংখ্যা লঘিষ্ঠদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইসলামী আইনে নাই, এ কথা যাহারা বলেন, তাঁহারা যে কোন আসন দখল করিয়া বসিয়া থাকুন না কেন, ইসলামী দাসতূর সম্পর্কে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানগণ প্রকৃত মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারিবে না। আমার মনে হয়, যাহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা 'ঘোড়া আগে গাড়ী জোড়ার' ইংরাজী প্রবাদ সত্য করিয়া দেখাইতে চান। আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, রাষ্ট্রের সার্থকতা কী? মুসলমানদিগকে প্রকৃত মুসলমান বানাইবে কে? মানুষেরা চুরি, ডাকাতী, চোরাকারবারী, কালবাজারী, উৎকোচ, উৎপীড়ন ছাড়িয়া দিয়া শান্তিপ্রিয় ও আইনাশ্রয়ী হওয়ার পর পুলিশ নিয়োগ ও শন্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে একথা যেরূপ, উল্লিখিত উক্তিও কি তদ্রূপ নয়? আইনের প্রতিষ্ঠাকল্পে শাসন বিভাগের শক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুইজ ব্রিটিশ, আমেরিকান, সোভিয়েট বা যেকোন আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতার জন্য গভার্ণমেন্ট এবং তাহার প্রশাসন আবশ্যক কিন্তু ইসলামী দাসতূর বলবৎ করার জন্য গভার্ণমেন্টের প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা উচ্চারণ করা কি সুস্থ বুদ্ধির পরিচায়ক? ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ শ্রবণ করুন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

'যদি আমি মুসলমানদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান করি, তাহা হইলে তারা ছালাত কায়েম করিবে, যাকাত নিয়ন্ত্রিত করিবে, উত্তম কার্যের জন্য আদেশ করিবে এবং নিষিদ্ধ কার্য হইতে লোকদিগকে বিরত রাখিবে এবং সকল কার্যের পরিণামফল আল্লাহ্র হাতেই আছে' *(হজ্জ ২২/৪১)*।

কেউ কেউ ভয় প্রদর্শন করেন যে, পাকিস্তানে ইসলামী আইন প্রচলিত করিলে হিন্দুস্তানে হিন্দু আইন বিধিবদ্ধ হইবে। এ কথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, পাকিস্তানের আচরণকে হিন্দুরা তাহাদের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে নাই। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নাগরিকদিগকে যেভাবে তোয়াজ করা হইয়া থাকে এবং যেভাবে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা গরিষ্ঠ নাগরিকদের পক্ষেও যেসরূপ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করা সম্ভবপর নয়। পুরাতন মানসিক দীনতার বশবর্তী হইয়া হউক অথবা অতিরিক্ত উদারতার ভান করিয়াই হউক, অনেক ক্ষেত্রে মুসলিমদের সঙ্গত দাবীকে উপেক্ষা করিয়াও পাকিস্তানে অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মন যোগাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে; অথচ এই রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার দাবী করা সত্ত্বেও সংখ্যা লঘিষ্ঠদের অনেকে পাকরাষ্ট্রের শত্রম্নতাসাধনের কার্য হইতে এক দিনের জন্যও নিরস্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে উল্লিখিত আচরণের বিনিময়ে পশ্চিম বাঙ্গালায় মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠদের সহিত যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করা হইতেছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সুতরাং পাকিস্তান ইসলামের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেই যে হিন্দুস্তানের মুসলিমরা শান্তি লাভ করিবে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। তারপর আসল কথা এই যে, হিন্দু আইন বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন বস্তু থাকে, আর তাহা যদি ইসলামী শরী'আত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হয় তাহা হইলে তার জন্য আমাদের ভয় করার কি আছে? আর যদি ইসলাম বাস্তবিক স্বভাব ও ন্যায়পরায়ণতার পূর্ণপরিণত ও আদর্শ জীবন পদ্ধতির নাম হয়, তাহা হইলে যে কোন বিধানের সমকক্ষতায় তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যে ইতস্ততঃ করার কারণ কি? আমাদের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে ইসলামকে জয়যুক্ত করা, ইসলামকে স্বার্থোদ্ধার ও প্রতিষ্ঠালাভের বাহনে পরিণত করা নয়। উচ্চধক্ষনি, বক্তৃতা ও ভোটযুদ্ধের কসরতের পরিবর্তে হাতে-কলমে, ব্যবহারে ও আইনে আমাদিগকে আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত করিতে হইবে। ইসলামের সাম্য, সার্বজনীনতা, মানবপ্রেম ও ন্যায়-নিষ্ঠা সম্পর্কে যাহারা অজ্ঞ বা সন্দিহান, কেবল তাহারাই ইসলামী আইনের সমকক্ষতার অন্যরূপ সংস্কার ও বিধানের সফলতার আশঙ্কা পোষণ করিতে পারে।

এ পর্যন্ত লিখিত হওয়ার পর পাকিস্তান গণপরিষদে ভাবী Constitution সম্পর্কে উদ্দেশ্য-প্রস্তাবের যে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচারিত হয় আমি তাহা অবগত হইবার সুযোগ লাভ

Contents

করি। মূল ঘোষণার অনুলিপি এখনো স্বচক্ষে দেখি নাই কিন্তু সংবাদ পত্রের মারফত যতটুকু অবগত হইয়াছি, তাহাতে আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ‘হুকুমাতে ইসলামিয়ার’ উচ্চাদর্শ উক্ত ঘোষণায় স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। দুই শ্রেণীর পরস্পর বিরোধী স্কুলের দুই প্রকার মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঘোষণার ভাষা অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। থিওক্রেসীর দুর্নাম এড়াইবার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত চেষ্টা সত্ত্বেও Secular বা লা-দ্বীনী স্টেটের বৈশিষ্ট্য এই ঘোষণায় বিদুরীত হয় নাই। থিওক্রেসীর সরল অর্থ হইতেছে পাদ্রীতন্ত্র, পীরতন্ত্র, ব্রাহ্মণতন্ত্র বা লামাতন্ত্র-ইসলাম কোন দিন এই শ্রেণীর শাসনতন্ত্রের বৈধতা স্বীকার করে নাই। সুতরাং থিওক্রেসীর অবতারণা ইসলামী রাষ্ট্রে অবান্তর। ইসলামে যেরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষ নিষ্পাপ ও আইনের স্রষ্টারূপে স্বীকৃত হয় নাই, সেইরূপ ইসলাম মানুষের কোন দল বা গ-কিেও নির্ভুল বলিয়া মান্য করে নাই। সুতরাং আইন প্রণয়নের মৌলিক ও সার্বভৌম অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহ যে সকল দেশের ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং সর্বশক্তিমান সেকথা পৃথিবীর সমুদয় রাষ্ট্রের আইন প্রণেতারা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রে গৃহীত হইয়া থাকিলে তা পাকিস্তানের বিশেষত্বরূপেই ঘোষণা করা উচিত ছিল। আর জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য, কিন্তু ইসলামী হুকুমতের ইহাই সবটুকু নয়। ইসলামী হুকুমতের গঠনতন্ত্র ও আইন কোন অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাতে ছহীহার প্রতিকুল হইতে পারিবে না। পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে জাতিগঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের শক্তি নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক এবং উহাই কায়েদে আযমের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ততার পরিচায়ক। আমরা **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-কে বাঁচাইয়া রাখিতে চাই কেন? ইসলামের জাতীয়তা আদর্শবাদ (Ideology)-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জাতীয় একত্ব ও সংহতি (Consolidation) ইসলামী মতবাদের সজীবতা ও সংরক্ষণের উপর নির্ভর করিতেছে। মুসলিমগণের অতীত ইতিহাস সাক্ষী রহিয়াছে যে, মুসলিমদের জাতীয় সংহতির বিধক্ষস্তি সকল সর্বনাশের মূল। আমাদের জাতীয় সর্বনাশ বিদূরিত করিতে হইলে আমাদিগকে সম্মিলিত হইতে হইবে। আমাদের সম্মিলনের কেন্দ্র কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব, মতবাদ, Theory, মাযহাব, স্কুল বা কল্পিত আদর্শ হইবে না। আমাদের সকলকে কুরআন ও হাদীছের পবিত্র কেন্দ্রে সমবেত হইতে হইবে। জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবিত করিতে হইলে আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে আর ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিরে চলিবে না। মন ও মস্তিষ্ককে জাগরিত করিতে হইবে। আমাদিগকে সর্বপ্রকার বিজাতীয় ও স্বজাতীয় তাক্বলীদের মায়াবন্ধন ছেদন করিতে হইবে।

لا اصلاح إلا بدعوة ولا دعوة الا بحجة ولا حجة مع بقـــاء التقليـــد- فاغلاق باب التقليد الاعمي و فتح باب النظر والاستدلال هو مبدء كل اصلاح فيا اخواني رحمكم الله- حي علي الفلاح!!

হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ অলিউল্লাহ সত্য কথাই বলিয়াছেন,

مسائل كثيرة الوقوع غير محصور اند و معرفت احكام النبى در انها واجب-وانچه مسطور ومدون شده است غير كافي-ودر انها اختلاف بسيار كہ بدون رجوع باد لہ حل اختلاف ان فنون كردو طرق ان تا مجتهدين غالبا منقطع چس بغير عرض بر قواعد اجتهاد راست نيابد-

‘নিত্তনৈমিত্তিক ও সর্বক্ষণ প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহের সংখ্যা অফুরন্ত অথচ সে সকল সমস্যার সমাধানকল্পে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অবগত হওয়া অবশ্যকর্তব্য। যাহা লিখিত ও সম্পাদিত হইয়াছে তাহা যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি সেইগুলির মধ্যে মতভেদ এতবেশী যে, মূল দলীল অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত মতভেদসমূহের মীমাংসা করা আদৌ সম্ভবপর নয় এবং মুজতাদিগণের অধিকাংশ রেওয়াতের সনদ বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ইজতিহাদের (Assertion) নিয়ম অনুযায়ী সকল উক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়া কোন উপায় নাই’ *(শরহে মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ১২)*।

আমি বলিতে চাই যে, এমন শত শত অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও তামাদ্দুনিক প্রশ্ন আজ দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে যে গুলির সমাধান অতিক্রান্ত মুজতাহিদগণের উক্তির ভিতর আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না অথবা তাঁহারা যে পরিবেশষ ও অবস্থার মদে যে সকল বিষয়ের সমাধান করিয়াছিলেন আজিকার পরিবেশ ও অবস্থা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় তাঁহাদের সমুদয় সমাধান আজ কার্যকরী নয়। সুতরাং ইজতিহাদের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিতেই হইবে এবং কুরআন ও হাদীছকে শুধু বরকতের বস্তু স্থির না করিয়া জাগ্রত মস্তিষ্ক ও উন্মিলিত চক্ষু লইয়া পাঠ করিতে হইবে। এই কার্য শুধু **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর সাহায্যেই সাধিত হওয়া সম্ভবপর।

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-কে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইলে স্বয়ং আহলেহাদীছদিগকে সর্বাগ্রে সংশোধিত হইতে হইবে। এই আন্দোলনের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস আছে কি-না, সর্বপ্রথম তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সন্দেহ, দ্বিধা ও Inferioity Complex-মানসিক দীনতার পীড়ায় যাহারা আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে কোন বলিষ্ঠ আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। আহলেহাদীছ নামধারী আমাদের অনেক বন্ধুর এ আন্দোলন সম্বন্ধে ধারণা একান্ত অস্পষ্ট ও ধুম্রাচ্ছন্ন-তন্দ্রাবিজড়িতের স্বপ্নবৎ। কেউ কেউ ইহার মূলনীতিকেই বিশ্বাস করেন না, কেউ ইহাকে বিশ্রম্ভালাপের বিষয়বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কেউ আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্ত-সিঞ্চিত এই আমানতের নাম ভাঙ্গিয়া খাইতেছেন। আমাদের মধ্যে কর্মবিমুখতা ও দায়িত্বহীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাক্বলীদ ও দল-বন্দীর অভিশাপ প্রবেশ করিয়াছে। **আহলেহাদীছ আন্দোলন**-এর মূলনীতিকে সফল করার যে সুবর্ণসুযোগ আজ উপস্থিত হইয়াছে, এই শুভ মুহূর্তে আন্দোলনের বাহকদল পিছাইয়া পড়িতেছেন। কেউ কেউ আমাদিগকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইতেছেন। কোন আন্দোলনের নীতি ও আদর্শ যতই সুন্দর ও বলিষ্ঠ হউক না কেন, তাহার ধারক ও বাহকগণ অযোগ্য ও অক্ষম হইলে সফলতার আশা সুদূর পরাহত।

অতএব আমাদিগকে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, আমাদের দোষত্রন্নটির সংশোধন করিয়া আমাদিগকে সজ্ঞবদ্ধ হইতে হইবে। সকল সন্দেহ ও দ্বিধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় পদবিক্ষেপে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। অখ-মুসলিম জাতির স্বার্থ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা করার কার্যে আমাদিগকে অগ্রণী হইতে হইবে। কুরআনের নির্দেশমত আমাদের নষ্ট ক্ষাত্রশক্তি আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইসলামে ক্ষত্রিয় সমাজ বলিয় নির্দিষ্ট কোন শ্রেণী নাই। ইসলামের প্রত্যেক অনুসরণকারী এই ভ্রাতৃসজ্ঘের প্রত্যেকেই সভ্য মুজাহিদ। যে জিহাদ করে না এবং জিহাদের বাসনা যাহার অন্তরে জাগ্রত হয় না তাহার মৃত্যু নিফাক্বের অন্যতম অবস্থায় ঘটিবে। কিন্তু আমাদের শক্তি চর্চা আমাদের যুদ্ধ বিদ্যার সাধনা জাতি বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়-ইলাহে কালেমাতুল হক্ব বা সত্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নকল্পেই আমদের দৈহিক ও মানসিক বল প্রযুক্ত হইবে। ইসলামে স্বতন্ত্র্য কোন মিশনারী বা পাদ্রী শ্রেণী নাই। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, মুসলিম সৈনিক ও ব্যবসায়ীগণের চরিত্র মাধুর্য ও দৃঢ় ইসলামিকতার জন্যই ইসলাম দুনিয়ার বুকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। সুতরাং

পাকিস্তানের আনছার বাহিনী ও ন্যাশনাল গার্ডকে শুধু দেশরক্ষী পল্টন হইলে চলিবে না, তাহাদিগকে মুজাহিদে ইসলাম সাজিতে হইবে, সত্যিকার মুসলিম হইতে হইবে।

‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস’ যখন গঠিত হইয়াছিল তখন বাংলা বিভক্ত হয় নাই এবং আসাম প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে বলিয়াই ধারণা ছিল। প্রাদেশিক বাঁটোয়ারার রোমাঞ্চকর পরিণতি সম্বন্ধে কোন আশঙ্কাই কাহারো মনে জাগ্রত হয় নাই। আজ এই বিভাগ যখন উভয় রাষ্ট্র মানিয়া লইয়াছে তখন পশ্চিম বাঙ্গালা ও আসামের মুসলিমগণ সম্পর্কে দু’একটি কথা আমাকে বলিতে হইবে। সর্বসাধারণ আমার উক্তি গুলি যদি বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে সুখী হইব।

হাযার বৎসরের পরাধীনতার পর হিন্দুরা আযাদী লাভ করিয়াছে। তাহার ফলে তাহারা যেভাবে মতিয়া উঠিয়াছে এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হিন্দুস্তানের সঠিক গণতান্ত্রিক মর্যাদা লাভ করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রভূক্ত প্রত্যেক সমাজ আপনাপন ধর্মীয় ও কৃষ্টিয় স্বাধীনতা উপভোগ করিতে এবং যাহাতে সকলেই রাষ্ট্রের তুল্য নাগরিকরূপে বসবাস করতে পারে, সেরূপ উদারতা অন্ততঃ মুসলিমদের বেলায় হিন্দুস্তানের হিন্দুরা প্রদর্শন করিবেন না। এমতাবস্থায় হিন্দুস্তানের মুসলিমগণের কর্তব্য কি? ইহার প্রতিকার স্বরূপ তিনটি ব্যবস্থার মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ সকল মুসলিমের পাকিস্তানে হিজরত করিয়া চলিয়া আসা।

দ্বিতয়তঃ ধর্ম ও কৃষ্টির সর্বাধিক স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলী দিয়া হিন্দু জাতীয়তার ভিতর বিলীন হইয়া যাওয়া।

তৃতীয়তঃ প্রকৃত মুসলিমরূপে হিন্দুস্তান রাষ্ট্রের বসবাস করা এবং উক্ত রাষ্ট্রকে আপন রাষ্ট্ররূপে গ্রহণ করা।

আমার বিবেচনায় প্রথমোক্ত উপায় কার্যকর নয়। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পশ্চিম বাংলা ও আসামের সমুদয় বাস্তুহারার ভার বহন করা যেরূপ অসম্ভব, তেমনি পশ্চিম বাংলা ও আসামের সমুদয় মুসলিমের পক্ষেও দেশত্যাগী হওয়া সম্ভবপর নয়। যাঁহারা শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থার লোক কেবল তাঁহারাই দেশত্যাগ করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন। ব্যাপক উৎপীড়নের ফলে জনসাধারণের পক্ষেও দেশত্যাগী হইবার জন্য উদ্যত হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত স্বার্থের সংরক্ষণকল্পে দেশত্যাগী হওয়ার জন্য যে অনুভূতি ও বোধশক্তির প্রয়োজন, জনসাধারণের তাহা নাই। ফলে শিক্ষিত ও স্বচ্ছল অবস্থার লোকগুলি হিন্দুস্তান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে মুসলিম জনসাধারণ একেবারেই অসহায় হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পক্ষে ‘যবন হরিদাস’ হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর রহিবে না।

ধর্ম ও তামাদ্দুনের বিশেষত্ব বিসর্জন দিয়া হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে বিলীন হওয়ার সরল অর্থ হইতেছে মুসলিম না থাকা। এই পন্থা অবলম্বন করিতে বৈষয়িক কিছু সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু কালক্রমে ইসলামকে চিরবিদায় দিতে হইবে। অন্যান্য ধর্মগুলি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের নামান্তর হইতে পারে কিন্তু ইসলাম সে শ্রেণীর ধর্ম নয়। আচরণ ও সংস্কার বিসর্জন দিয়া ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত করার জন্য যাহাদিগকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা হইতেছে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা কোন ধর্মেরেই ধার ধারেন না।

আমি মনে করি পশ্চিম বাংলা ও আসামের মুসলিমদিগকে আপন জন্মভূমিতে মুসলিমরূপেই টিকিয়ে থাকিতে হইবে; কিন্তু হিন্দুদের সহিত রাষ্ট্রীয় অধিকারের সকল প্রতিযোগিতা পরিহার করিয়া। যাহাতে হিন্দুর মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে পারে, এরূপ কার্য এমনকি আবশ্যক বিবেচিত হইলে এমনতর মুসতাহাব কার্যও পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহাদের অসদ্ব্যাহারকে ইসলামের মুখ চাহিয়া সহাস্যে কবুল করিতে হইবে। পশ্চিম বাংলা ও আসামের মুসলিমগণের আদর্শ হইবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবন। মুসলিমদিগকে যুগসঞ্চিত অনাচার ও গায়ের ইসলামী আক্বায়েদ ও আচরণের আমূল সংস্কার করিতে হইবে অর্থাৎ অবিশ্রিত ইসলামের সুমহান ও গরীয়ান আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে; সহজ কথায় প্রকৃত মুসলিম হইতে হইবে। প্রকৃত ও অবিশ্রিত ইসলামের অমোঘ শক্তি বহু পরীক্ষিত ও ইতিহাস-বিশ্রুত। হুদায়বিয়ার পরাজয়কে আল্লাহ ‘ফাতহুল মুবীন’ বা প্রকাশ্য বিজয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ ইসলামী আচরণের সাহায্যে মযলুম মুসলিমগণ মক্কাবাসীদের চিত্তজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পরামর্শ কার্যে পরিণত করা দুঃসাধ্য; কিন্তু মন্ত্রিত্বের দু’একটি আসন আর দু-দশটা চাকুরীর জন্য ইসলামকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়া বা সমস্ত মুসলিমের পূর্ব পাকিস্তানে চলিয়া আসার মত কার্য অসাধ্য নয়। আমাদের পাপের কাফফারার জন্য অন্য কোন উপায় আমি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। হিন্দুরাজ্যের ভিতর ইসলামকে বর্জন বা প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া তৃতীয় কোন পন্থা নাই। হিন্দুস্তানের মুসলিমরা সঙ্কল্পবদ্ধ হইলে ইসলামকে আবারো প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, বলিতে কি কোন কোন দিক দিয়া পাকিস্তান অপেক্ষা তাঁহাদের হস্তে অধিকতর সুযোগ রহিয়াছে। পাকিস্তানের মুসলিমরাও মাতিয়া উঠিয়াছে অবশ্য হিন্দু-বিদ্বেষের উৎকট রোগে নয়, বিলাসিতা ও সুবিধাবাদের উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে আর ইসলাম প্রত্যেক কারবালার ভিতর দিয়াই চিরদিন পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে।

قتل حسین اصل مین قتل یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد!

‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস’ এক বৎসর কালের মধ্যে যে অকিঞ্চিৎকর খেদমত আঞ্জাম দিয়াছে, জমঈয়তের কাইয়েমে আলা মওলভী মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ছাহেব বি. এ. বি. টি-এর রিপোর্টে তাহা আপনারা শ্রবণ করিবেন। সমুদ্রে শিশির বিন্দুর ন্যায় এই কার্য! জমঈয়তকে তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌছতে হইলে আপনাদের সমবেত সহানুভূতি, বিপুল প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক। আমরা যে ভার আমাদের দুর্বল স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছি, আমরা জানি, তাহা বহন করার মত শক্তি ও যোগ্যতা আমাদের নাই। আপনাদের মধ্যে যোগ্য, পারদর্শী এবং সুগভীর ও প্রসারিত দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অভাব নাই। আমি ইসলামের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ্‌র নামে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। আসুন! ভাঙ্গাগড়ার এই যুদ্ধসন্ধিক্ষণে আমরা ব্যক্তিগত মতবিরোধ, আত্মাভিমান এবং দলগত গোঁড়ামী, হটকারিতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করিয়া কুরআন ও হাদীছের প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম জাতির সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করি। সর্বসিদ্ধিদাতা রহমানুর রহীম আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে এই দেশে আবার ইসলাম জীবন্ত প্রদীপ্ত, গৌরবান্বিত ও প্রাণবন্ত হউক, অতীতের ন্যায় ইসলাম পুনরায় মানব সমাজে নবযুগের সূচনা করুক।

بما قا گل بوا شانیم مسے در سا غوند ازیم!

فلک را سقف بشگافیم وطرح نو در اندازیم!

وما توفيقي الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل

وصل الله علي سيدنا محمد امام الاولين والاخرين و علي اله

و صحبه نجوم المهتدين-واخر دعوانا ان الحمد لله رب العامين.

[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত ‘আহলেহাদীছ পরিচিতি’ গ্রন্থ, পৃঃ ৮৮-১০২]

ইসলামের ছায়াতলে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ যুভান শংকর রাজা

-অনুবাদ ও সংকলন : কে.এম রেযওয়ানুল ইসলাম

ভূমিকা : ভারতের তামিল সিনেমার (কলিউড, চেন্নাই) বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ যুভান শংকর রাজার পরিচয়ের শেষ নেই। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই তরুণ একাধারে সংগীত পরিচালক, সংগীত রচয়িতা এবং গায়ক। সংগীত জগতে তার সাফল্য অভাবনীয়। কিন্তু এসব খবর নতুন নয়। নতুন খবর হল ৩৪ বছর বয়স্ক এই তরুণ শিল্পী পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।

যুভান শংকর রাজার ইসলাম গ্রহণের সত্যতা :

ভারতের প্রখ্যাত সংগীত রচয়িতা ইলাইয়ারাজার কনিষ্ঠ পুত্র যুভান শংকর রাজা, যিনি নিজেও একজন জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ। তিনি সম্প্রতি নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, মুসলিম হিসাবে তিনি গর্বিত এবং তার পরিবারও তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে। গত ১০ ফেব্রুয়ারী ভারতের বহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-এর এক প্রতিবেদনে যুভানের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী প্রকাশ করা হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে এ ধরনের খবর বাতাসে ভাসছিল। এক টুইটার বার্তায় যুভান নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ; আমি মুসলিম হয়েছি এবং এ জন্য আমি গর্বিত। আলহামদুলিল্লাহ'। তিনি টুইটারে আরও লিখেছেন, 'আমার পরিবার আমার সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে এবং (এ নিয়ে) আমার ও আমার বাবার মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি নেই'। যুভানের এক ঘনিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, যখন যুভান তার বাবাকে ইসলাম গ্রহণের কথা জানিয়েছিলেন, তখন ইলাইয়ারাজা প্রচ- কষ্ট পেয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ছেলের সিদ্ধান্তকে মেনে নেন। আরও একটি গুজব শোনা যাচ্ছিল যে, যুভান হয়তো কোন মুসলিম রমণীকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি এ গুজবকে নাকচ করে দিয়েছেন। 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকাকে তিনি বলেন, 'তৃতীয়বারের মত আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসছি না। খবরটি ডাহা মিথ্যা'।

ইসলাম গ্রহণের নেপথ্যে :

২০০৫ সালে ২৬ বছর বয়সে যুভান শংকর রাজা দীর্ঘদিনের পরিচিত সুজায়াকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাদের দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; ২০০৭ সালে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ৪ বছর পর ২০১১ সালে তিনি শিল্পা নামের এক মহিলার সাথে আবারো পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু এবারও তিনি সুখের সন্ধান পাননি। শিল্পা, যুভানকে ছেড়ে লন্ডনে তার বাবা-মার কাছে চলে যায়। যা যুভান শংকর রাজাকে হতাশার সাগরে নিমজ্জিত করে। এই বিপদের দিনগুলোতে মা-ই ছিলেন যুভানের একমাত্র সহায় এবং সান্ত্বার উৎস। কিন্তু আল্লাহ তাকেও যুভানের জীবন থেকে কেড়ে নেন। মাকে হারিয়ে যুভান প্রচ- আঘাত পান। এতে করে তার জীবনটাই এলোমেলো হয়ে যায়। এরপর হতাশাগ্রস্থ যুভান শান্তির সন্ধানে নতুন যাত্রা করলেন। কিন্তু শান্তি তো কোন দোকানে সাজিয়ে রাখা পণ্য নয় যে, আপনি গেলেন আর কিনে ফেললেন। যুভান জীবন নিয়ে চিন্তা-ভবনা শুরু করলেন। একদিন এক বন্ধু তার হাতে পবিত্র কুরআন তুলে দিল। যুভান গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন পড়তে লাগলেন। যখন সম্পূর্ণ কুরআন পড়া শেষ হল তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এতদিন ধরে তিনি যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তার সন্ধান তিনি পেয়ে গেছেন। এভাবেই যুভান ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হন। যুভানের এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি এভাবেই তার ইসলাম গ্রহণের পটভূমির বিবরণ দেন। উক্ত ঘনিষ্ঠ সূত্রটি আরও জানিয়েছে মা মারা যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরে অর্থাৎ প্রায় ১ বছর পূর্বেই যুভান হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে পদার্পণ করেন। সূত্রটি 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'-কে বলেছে যে, যুভান তার মার প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিলেন। যখন মা মারা গেলেন, তখন তিনি তার অনুপস্থিতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, 'তিনি একজন আধ্যাত্মিক সাধকেরও (মুসলিম বিশেষজ্ঞ) শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, প্রকৃতপক্ষে কে তাকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে'।

কেউ কেউ ধারণা করেন যে, ইসলামে দীক্ষিত ভারতের অস্কারজয়ী জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী এ. আর. রহমানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকি এ. আর. রহমান বা যুভান শংকর রাজাও এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি। একটি সাময়িকীতে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই তার ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, 'এটা কোন আকস্মিক সিদ্ধান্ত ছিল না। আমি প্রায় ২ বছর যাবৎ বিভিন্ন ধরনের বই পড়েছি এবং ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি। একসময় পবিত্র কুরআন পড়া শুরু করলাম, যা আমার সব সন্দেহ-সংশয়ের উত্তর দিল। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমি ইসলামকে আলিঙ্গন করে ফেলেছি। কিন্তু কেউ আমাকে ইসলাম গ্রহণে সরাসরি প্রভাবিত করেনি। আমার বাবার জন্য এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার ছিল, যিনি নিজে একজন গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমার ইসলাম গ্রহণকে ভালভাবেই গ্রহণ করেছেন'।

ইসলামই আমাকে গ্রহণ করেছে :

যুভান একটি দৈনিক পত্রিকাকে বলেন, 'ইসলাম ধর্ম গ্রহণে কেউই আমাকে জোর করেনি; এমনকি অনুরোধও করেনি। আসলে আমি ইসলামকে বেছে নেইনি, ইসলামই আমাকে বেছে নিয়েছে'। তিনি আরও বলেন, 'প্রথমদিকে আমি প্রায়ই রাতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতাম; কিন্তু সেগুলোর কোন যুৎসই ব্যাখ্যা খুঁজে পেতাম না। পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম যে, আমি এক ধরনের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করছি। কুরআন পড়া শুরু করার পর আমি সেই স্বপ্নগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে পারলাম। সুতরাং আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলামই আমাকে গ্রহণ করেছে'।

ইসলাম গ্রহণের ফলাফল :

সফলতা, খ্যাতি, অর্থ, সন্তান-সন্ততি বা উচ্চপদ কোন কিছুই মানুষকে পরিপূর্ণ সুখী করতে পারে না। তবে সবাই সেই অবস্থায় যেতে চায়, যাতে মানুষ সব রকম উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে। একেক মানুষ একেক উপায়ে প্রশান্তির সন্ধান করে থাকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, সাধনা বা সন্ধান না করলে তা পাওয়াও দুষ্কর। সর্বোপরি, আল্লাহ্র রহমত ছাড়া কেউই পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি একবার সেই আত্মিক প্রশান্তির অমূল্য স্বাদ পেয়ে থাকেন, তবে দুনিয়াতে তার চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই থাকে না। ভারতের জীবন্ত কিংবদন্তী 'মাদ্রাজের মোজার্ট' খ্যাত এ. আর. রহমান এভাবেই ইসলামের সংস্পর্শে এসে অনাবিল সুখ-শান্তির পরশ পেয়েছেন। ইসলাম এবং এক আল্লাহ্তে দৃঢ় বিশ্বাস তার জীবনকে পরিপূর্ণ করেছে। ঠিক তেমনি যুভান শংকর রাজাও ইসলামে পেয়েছেন শান্তি, স্বস্তি আর সান্ত্বনা। যুভানের কিছু কাছের মানুষ জানিয়েছেন, এখন যুভান আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক নির্ভার, নিশ্চিন্ত আর সুখী। তারা আরও জানিয়েছেন যে, যুভান ইসলামের বিধি-বিধানগুলো নিয়মিত অনুসরণ করছেন। তিনি এখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন। এমনকি কাজের মধ্যে থাকলেও তার ছালাত কাযা হয় না। যুভান তার নাম পরিবর্তনের ব্যাপারেও ভাবছেন।

[লেখক : তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী]

সিন্ধুতীরের করাচীতে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(এক)

আকাশ থেকে প্রথম দেখায় সিন্ধু অববাহিকার বিস্তীর্ণ ধুসর লালচে ভূখ-ের পাড় ঘেঁষে অবস্থিত করাচী শহরকে যতটা সঙ্গীন ও অনাড়ম্বর মনে হয়েছিল, জনসংখ্যার হিসাবে বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম শহরটি যে বাস্তবে মোটেও সেরকম নয় তা অনুভব করতে দেরী হল না। বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে শহরে পা রাখতেই সুপ্রশস্ত রাস্তা, পরিপাটি ঘরবাড়ি, সুসজ্জিত বিপনীবিতানগুলো যখন স্বাগত জানাতে শুরু করে তখন ভুলটা ভাঙ্গে নিমিষেই। অবশ্য শহরের অভ্যন্তরে যতই ঢোকা যায় শহুরে জাঁকজমকের পাশাপাশি দারিদ্রের ছাপগুলো সমানহারে আড়াল ফুঁড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে থাকে। মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হয় প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা রাস্তার দুধার জুড়ে শতবর্ষের পুরোনো জরাজীর্ণ কুলীন ঘরবাড়িগুলো। সেদিকে তাঁকিয়ে থেকে কখনওবা নিজেকে ফেলে আসা দূর অতীতের কোন এক বাঁকে পরিভ্রমণরত নিবিষ্ট পরিব্রাজক মনে হয়। সিএনজি রিকসায় চড়ে মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ শহর হিসাবে পরিচিত করাচীর ডাউনটাউন অভিমুখে যেতে যেতে বিচিত্র সব অনুভূতি এমনইভাবে দোলা দিয়ে যাচ্ছিল।

একটু পিছনে ঘুরে আসা যাক। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী এই করাচী শহর। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত করাচী পাকিস্তানের প্রথম রাজধানী ছিল। অদ্যবধি এটি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক রাজধানী হিসাবে পরিগণিত। এর দক্ষিণ দিকে আরব সাগরের উপকূল। পশ্চিম দিকে ঠাট্টা জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া উপমহাদেশের বিখ্যাত সিন্ধু নদ আরব সাগরে পতিত হয়েছে, যার বিস্তীর্ণ অববাহিকা অঞ্চল এসে ঠেকেছে প্রায় করাচীর সীমানা পর্যন্ত।

করাচী নামটির উৎপত্তি হয়েছে 'কোলাচি' নামক একটি বালুচ গোত্র থেকে। এই গোত্রটি করাচীতে আরব সাগরের তীরে একটি জেলে পল্লী গড়ে তুলেছিল। কারো মতে, 'কোলাচি' এক বালুচ মহিলার নাম ছিল, যে সাগরতীরের একটি গ্রাম অধিকার করেছিল। তার নামানুসারে করাচীর নামকরণ করা হয়েছে। তবে আরবদের কাছে এই প্রাচীন শহরটির নাম ছিল দেবল। এখান থেকেই ৭১২ সালে তরুণ সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযান শুরু করেছিলেন। যার মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয় সূচিত হয়েছিল। সুদূর বাগদাদ থেকে পারস্য এবং মকরান হয়ে স্থলপথে প্রায় ৩০০০ কি.মি. পথ অতিক্রম করে তিনি সিন্ধু আক্রমণ করেন। করাচী শহর থেকে প্রায় ১০০ কি.মি. দূরে বর্তমান হায়দারাবাদের কাছে এক যুদ্ধে সিন্ধু রাজা দাহিরকে পরাজিত করার মাধ্যমে তাঁর সিন্ধু জয়ের সূচনা হয়। তারপর তিনি তাঁর বিজয়যাত্রা আরো প্রলম্বিত করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় যদি খলীফা বাগদাদে ডেকে না পাঠাতেন তবে একই সময়ে হয়ত তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানরা ইন্ডিয়া পর্যন্ত জয় করে ফেলত। এই মহান বীর মুজাহিদকে পাকিস্তানীরা আজও খুব গর্বভরে স্মরণ করে। পাকিস্তানের জাতীয় ইতিহাসে মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে সর্বপ্রথম পাকিস্তানী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া করাচীতে পাকিস্তানের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দরের নামকরণ করা হয়েছে 'পোর্ট কাসিম' নামে। ক্লিফটনে নির্মিত পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় পার্কটির নাম রাখা হয়েছে 'বাগে ইবনে কাসিম'। প্রতি বছর ১০ রামাযান তথা তাঁর সিন্ধুজয়ের দিবসটি পাকিস্তানে 'ইয়াউমে বাবুল ইসলাম' হিসাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

১৪ই মার্চ ২০১৪ বেলা একটার দিকে পিআইএ'র একটি ডমেস্টিক ফ্লাইটে ইসলামাবাদ থেকে করাচী এসে নামলাম। দেশে ফেরার পথে ট্রানজিট টাইমটা ইচ্ছা করেই একটু দীর্ঘায়িত করে নিয়েছিলাম, যাতে এই সুযোগে করাচী শহরটা দেখে নেয়া যায়। বিশেষ করে শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী হাফেযাহুল্লাহ'র সাথে সাক্ষাৎ করাটা ছিল মূল উদ্দেশ্য। এয়ারপোর্ট থেকে ১০ মিনিটের দূরত্বে পিআইএ'র নিজস্ব হোটেলটি। সেখানে নিজের রুমটা বুঝে নেয়ার পর গাঁটরিবোঁচকা কোনমতে ছুড়ে দিয়েই জুম'আর ছালাত ধরার জন্য ছুটলাম পার্শ্ববর্তী মসজিদে। ছালাত শেষে আবার হোটেলে ফিরে স্বল্প মাত্রায় বুফে লাঞ্চ সেরে নিয়ে আবার বের হলাম।

প্রথম গন্তব্য সোলজার বাজারে অবস্থিত 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া করাচী'। আবক্ষার থিসিস থেকে লোকেশানগুলো মার্ক করে রেখেছিলাম। ফলে আগে থেকেই গন্তব্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা ছিল। হোটেলের সামনে থেকে স্মার্ট ইংরেজী বলনেওয়ালা ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মধুর বাতচিৎ এড়িয়ে বেশ কসরৎ করে একটি সিএনজি ভাড়া করলাম। ফয়সাল এভেনিউ ধরে প্রায় ৪০ মিনিট যাত্রার পর শহরের কেন্দ্রস্থলে এম এ জিন্নাহ রোডে এসে কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্‌র মাযার মোড় অতিক্রম করে সিএনজি ঢুকে যায় সোলজার বাজারের দিকে। বিখ্যাত নিশতার পার্ক ময়দান (এই ময়দানে শেখ মুজিব, শেরে বাংলা, মাওলানা ভাসানীর মত বাঙালী রাজনীতিবিদরা বক্তব্য রেখেছিলেন) অতিক্রম করার পর ক্লিফটন রোড। তারপরই সোলজার বাজার এরিয়া। বাজারে ঢোকার পর বাঁধল বিপত্তি। পথচারীদের যাকেই জিজ্ঞেস করি কেউই 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া' চিনতে পারে না। সিএনজিওয়ালাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, বেচারাকে বেশী কষ্ট না দিয়ে নেমে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু এই শহরে আমি সদ্য আগন্তুক টের পেয়ে সে ছাড়ল না। অবশেষে এক মুরবক্ষী বললেন, 'এহা পে একহি আহলেহাদীছওয়ালা মসজিদ হ্যায় ওহ সফেদ মসজিদ, উধার যা কার কেসি সে পুছো'। তার কথা মত দু'চার গলি ঘুরে সফেদ মসজিদের সামনে আসতেই দেখি ছোট করে লেখা 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া করাচী'। বুঝলাম সফেদ মসজিদ আর দারুল হাদীছ রহমানিয়া তাহলে একই। তারপরও একটু সংশয় নিয়ে সিএনজি থেকে নামলাম।

এই কি সেই বিখ্যাত মাদরাসা?! নাম-যশ, অতীত ঐতিহ্যের সাথে এর বর্তমান রুগ্ন কাঠামো মেলাতে সত্যিই কষ্ট হ'ল। সফেদ সাদা গেটটা অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলাম। হাতের বামে অতি সাধারণ রিসিপশন কাম মাদরাসার অফিস রুম। উপস্থিত অফিস সহকারীর সাথে কুশল বিনিময় ও পরিচিত হবার

পর শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুটা বিব্রত ও নিরাসক্ত কণ্ঠে উনি জানালেন, ‘শায়খ তো এখানে আর থাকেন না’। এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। ‘থাকেন না মানে, উনি এখানকার মুদীর নন?’ দ্রুত কয়েকটি প্রশ্ন করতে উনি আর কথা না বাড়িয়ে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন আমাদের এখানে একজন বাঙালী শিক্ষক আছেন উনার কাছেই সব জানতে পারবেন। বাঙালী শিক্ষক আছেন জেনে তো আরো অবাক হলাম, সেই সাথে বেশ উৎফুল্লও। কিছুক্ষণ পর একমুখ দাঁড়িভর্তি ছোটখাট গড়নের মানুষটি হাযির হলেন। পরিচয় দিলেন উনি খুলনা যেলার দাকোপ থানার আমীরুল ইসলাম এবং আমাদের সংগঠনেরই এক সময়ের তৎপর কর্মী বাগেরহাটের জনাব আব্দুছ ছাত্তার কালাবগীর ভাগিনা। মনে পড়ল বছর খানিক আগে এই নামেরই একজন ‘দারুল হাদীছ রহমানিয়া’ থেকে আমার কাছে ফোন করেছিলেন। ইনি যে সেই ব্যক্তিই। আবক্ষার করাচী ভ্রমণ স্মৃতিকথাতেও এই নামটি দেখেছিলাম। আজ এই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বলা যায় অভাবিতভাবেই তার সাথে সাক্ষাৎ। উনিও আমার পরিচয় জেনে বিস্মিত ও শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর করাচী আসার উদ্দেশ্য জানতে পেরে তখনই শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী’র (বর্তমানে মারকাযী জমঈয়ত আহলেহাদীছ সিন্ধের আমীর) সহকারী দাউদ শেখকে ফোন করলেন। জানা গেল শায়খ আজই সকালে শারজাহ থেকে ফিরেছেন। তারপর সোলজার বাজার থেকে অল্প দূরত্বে শীশা মার্কেটের পার্শ্বে অবস্থিত রহমানিয়া মসজিদে জুম‘আর খুৎবা দেয়ার পর এখন বাসায় রেস্টে আছেন। সন্ধার পর কোন এক সময় সাক্ষাৎ করা যাবে উনার মালীর আর্মী ক্যান্টনমেন্টের বাসায়। প্রায় ১২ বছর পূর্বে তিনি ‘দারুল হাদীছ রহমানিয়া’ ছেড়ে গেছেন এবং গুলিস্তানে জওহরে ‘মা‘হাদুস সালাফিয়া’ নামে নতুন মাদরাসা করেছেন। সেখানে বর্তমানে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্র পড়াশোনা করে।

আছর ছালাতের পর আমীরুল ভাই ষাটোর্ধ বয়সী মাদরাসাটি ঘুরে ঘুরে দেখালেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর দিল্লীর দারুল হাদীছ রহমানিয়া করাচীতে স্থানান্তরিত হয়। জনৈক ব্যবসায়ী আব্দুল ওয়াহহাব ছিলেন এর মূল উদ্যোক্তা। কেবল করাচী নয়, পাকিস্তানেরই অন্যতম প্রাচীন আহলেহাদীছ মাদরাসা এটি। এজন্য আকারে খুব ছোট হলেও সারা পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠানটিকে সবাই এক নামে চেনে। আমাদের আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া মাদরাসার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী, হিফয বিভাগের শিক্ষক জনাব হাফেয লুৎফর রহমান, পিস টিভি বাংলার আলোচক হাফেয আখতার মাদানী উনারা এক সময় এখানকার ছাত্র ছিলেন। শায়খ আব্দুল্লাহ নাছের রহমানীও এখানকার ছাত্র এবং পরবর্তীতে শিক্ষক ও মুদীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে মুদীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন মাওলানা সুলতান ছিদ্দীক বানারাসী। মূল স্থাপনা বলতে কেবল মসজিদটাই আর মসজিদ সংলগ্ন ৩ তলা একটি বিল্ডিং। বিল্ডিংটি শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাসিক থাকার জন্য। আর ক্লাস হয় আজও পর্যন্ত মসজিদেরই বারান্দায়। এছাড়া একটি দারুল ইফতা এবং কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে মাদরাসায়। নীচ তলায় লাইব্রেরীতে ঢোকার পর মনে হ’ল তা প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ধূলোয় ধুসরিত অনেক পুরোনো বই সেখানে। নতুন বইয়ের ভীড়ে সেসবের আর কদর নেই। কেবল কালের সাক্ষী হয়ে শোকেসের জায়গা দখল করে রেখেছে। দোতলায় উঠার পর একটি রুমে নিয়ে গিয়ে আমীরুল ভাই বললেন, ‘ডক্টর ছাহেব (আবক্ষা) ১৯৮৮ সালে যখন এসেছিলেন এখানে, উনাকে আমরা এই রুমে রেখেছিলাম’। সুদীর্ঘ ২৫ বছর আগের সেই সময়টি তার স্মৃতিতে এখনো টাটকা। অতীত-বর্তমানের আচমকা সম্মিলন এক ঝটকায় বহু দূরে কোথাও নিয়ে গেল আমাকে। মনের জানালায় ফ্লাশব্যাক হয়ে ভেসে উঠতে চাইল একের পর এক ইতিহাসের মেলবন্ধনে বিগত হয়ে যাওয়া জানা-অজানা কত মানুষ, কত ঘটনা, কত উপখ্যান।

মাদরাসা ঘুরে দেখার পর আমীরুল ভাইয়ের ‘শতবর্ষী’ বনেদী গোত্রের ঠনঠনে মটরসাইকেলটিতে চেপে বসলাম তারিক রোডের উদ্দেশ্যে। আহলেহাদীছ আক্বীদার বইপত্র কোথায় পাওয়া শুধাতে আমীরুল ভাই উর্দূবাযারের পরিবর্তে সোজা এখানেই নিয়ে আসলেন। ডলমেন শপিং মলের নিকটেই মাকতাবা দারুস সালাম। দো’তলা শোরুমটা দারুণ আভিজাত্যপূর্ণভাবে সাজানো। এমন সুসজ্জিত বইয়ের দোকান সচরাচর চোখে পড়ে না। সত্ত্বাধিকারী শায়খ আব্দুল মালেক মুজাহিদ খুব দক্ষ হাতে এই ইসলামী প্রকাশনা সংস্থাটিকে একটি আন্তর্জাতিক স্টান্ডার্ডে দাঁড় করিয়েছেন। পাকিস্তানসহ বহির্বিশ্বের প্রায় ২০/২৫টি দেশে আহলেহাদীছ আক্বীদা প্রচারে দারুস সালাম যে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে গত প্রায় দুই দশক ধরে, তা এক কথায় অসাধারণ। উর্দূ ছাড়াও আরো ৮/১০টি ভাষায় এখান থেকে বইপত্র প্রকাশিত হয়। সেল্স ম্যানেজারের সাথে পরিচিত হওয়ার পর কিছু বই কিনে সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম।

তারপর তারিক রোডেই ঝিল পার্কের সম্মুখস্থ দারুল হাদীছ রহমানিয়ার সাবেক শায়খুল হাদীছ এবং বর্তমানে একটি সরকারী হাইস্কুলের সিনিয়র ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা আব্দুল হান্নানের বাসায় আসলাম। আমীরুল ভাই উনাকে আগেই খবর দিয়ে রেখেছিলেন। আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। মধ্যবয়সী নিপাট ভদ্রলোক মানুষ। শিক্ষকতার পাশাপাশি জামশেদ টাউনের বালুচ কলোনীতে তিনতলা সুরম্য আহলেহাদীছ মসজিদ ‘জামে মসজিদ ছিদ্দীকে’র খত্বীব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছেন। মাগরিবের আগে উনার প্রাইভেট কারে আমাদের নিয়ে গেলেন আরব সাগরের তীরে ক্লীফটন সী বীচে। নিজেই ড্রাইভ করলেন। ক্লিফটন রোড ধরে প্রায় ১০ কি.মি. পথ অতিক্রম করার পর যখন সী বীচ পৌঁছলাম তখন মাগরিবের আযান শেষ। সমুদ্র তীরে ওছমান গণী (রাঃ) জামে মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায় করলাম। আমীরুল ভাই বললেন, এই মসজিদটির ছবি ‘আত-তাহরীকে’র কোন এক সংখ্যার প্রচ্ছদে এসেছিল। আমার অবশ্য মনে পড়ল না।

সুন্নাত ছালাত শেষে মাওলানা আব্দুল হান্নান আর আমি মসজিদের বাইরে অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। আমীরুল ভাইয়ের কোন খবর নেই। দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে ছালাত আদায় করার পর অবশেষে যখন উনি বের হলেন, তখন চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। সী বীচে আসতে আসতে তাই রাত হয়ে গেল। অন্ধকার রাতে আকাশে চাঁদ তো নেই-ই তারাগুলোও সব একযোগে কোথাও উধাও হয়ে গেছে। হাইওয়ের স্ট্রিট লাইটগুলোই যা একটু ভরসা। উত্তাল আরব সাগরের বুক ছুঁয়ে আসছে বিশুদ্ধ ভারী বাতাস। সুবাহানাল্লাহ কি যে প্রশান্তিময় সে বাতাস! নিঃশ্বাসের সাথে রাজ্যের সব ক্লান্তি, অস্থিরতা যেন ধুয়ে মুছে ছাফ হয়ে যায়। ঢেউয়ের উচ্ছল নাচনে অনেকটা সময় পা ডুবিয়ে হাটতে থাকি। ক্লিফটন সৈকতটা দৈর্ঘ্যে কক্সবাজারের

মত দিগন্ত বিস্তারী নয়। তবে মসৃণ দীর্ঘ বালুতট আর সাগর তীরের পরিচ্ছন্ন হাইওয়ে, পালতোলা জাহাযাকৃতির হোটেলগুলো একে অন্য রকম সুষমা দান করেছে। এই রাতেও পর্যটকের যথেষ্ট ভীড়। এখানকার বিশেষ আকর্ষণ বোধ হয় আপাদমস্তক সুসজ্জিত উটগুলো। মরুর জাহায দিব্যি পানির জাহায বনে গিয়ে পর্যটকদের নিয়ে ঘুঙুর বাজাতে বাজাতে সাগরের পানিতে নেমে পড়ছে।

ঘণ্টাখানিক পর সেখান থেকে ফিরে তারিক রোডে মাছের জন্য সুপ্রসিদ্ধ হোটেল ইয়াদগারে নিয়ে গেলেন আমীরুল ভাই। সেখানে নাম না জানা এক বড় সামুদ্রিক মাছের ফ্রাই খেলাম। করাচীতে সিন্ধু নদ এবং সমুদ্রের কারণে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামাবাদ তথা পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে মাছের আমদানী খুব কম। ফলে পাকিস্তানে আসার পর মাছের স্বাদ প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। অনেকদিন পর মাছের স্বাদ পেয়ে বাঙালীত্বের মর্ম বেশ ভালই টের পেলাম।

এদিকে শায়খ নাছের রহমানীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হল না। জনাব দাউদ শেখ জানালেন, উনি খুব অসুস্থ, ঘুমিয়ে আছেন, কখন জাগবেন বলা যাচ্ছে না। ফলে উনার সাথে সাক্ষাতের পরিকল্পনা বাতিল করে গুলশানে ইক্ববাল টাউনে অবস্থিত জামেআ' আবু বকরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

গুলশানে ইকবাল ফ্লাইওভার পার হবার পর করাচী ইউনিভার্সিটি রোড থেকে বামদিকে টার্ন নিয়ে অল্প কিছুদূর গেলেই মাদরাসাটির অবস্থান। প্রায় আধাঘণ্টা যাত্রার পর যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে ৯টা বেজে গেছে। এই রাতে হঠাৎ কোন মেহমানের উপস্থিতি মেজবানদের জন্য বেশ বিব্রতকর। এ জন্য কারোর সাথে দেখা না করে ভিতরটা সামান্য একটু দেখে ফিরে আসব ভাবছিলাম। গেটম্যানকে বলে ভিতরে ঢোকার পর দেখলাম চারতলা সুদৃশ্য দু'টি ভবনকে সংযুক্ত করে মাদরাসার সামনে এক বিশাল চওড়া চাতোয়ান। পুরোটাই সাদাকালো চকরা-বকরা টাইলস দিয়ে মোড়ানো। দু'ধারে গাছ লাগানোর জন্য প্রাচীরের ধার দিয়ে একটু উঁচু করে ঘেরাও করা। তারই এক কোণে বসে মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগের নায়েবে মুশরিফ মাওলানা খালেদ মাহমূদ এক ছাত্রের সাথে বসে কথা বলছিলেন। আমরা সরাসরি উনার সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করলাম এবং মাদরাসা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে চাইলাম। উনি আমাদেরকে মাদরাসা অফিসে নিয়ে বসালেন। সেখানে আরো কয়েকজন শিক্ষকের সাথে দেখা হল। তারপর চা-নাস্তা করে মাদরাসা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'উসওয়াহ হাসানাহ' এবং মাদরাসা পরিচালনা পদ্ধতি সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র নিয়ে বের হলাম। মাওলানা খালেদ মাহমূদ মাদরাসার আবাসিক বিল্ডিং, লাইব্রেরী এবং কম্পিউটার ল্যাব ঘুরে দেখালেন। ছাত্রদেরকে দেখলাম শিক্ষকদের সাথে আরবীতে কথা বলছে। মুশরিফ ছাহেব জানালেন এই মাদরাসাটি পুরোপুরি আরবী মিডিয়াম, এখানে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বলা নিষেধ। পাঠ্যনীতিতে প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হয়। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এখানে ২ বছরের 'মা'হাদুল লুগাহ' বা ভাষা ইনস্টিটিউট (আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স) গড়ে তোলা হয়েছে। পাকিস্তানে এই ধাঁচের মাদরাসা আর নেই।

করাচী ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের সাবেক প্রফেসর শায়খ যাফরুল্লাহ (রহ.)-এর উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে এই মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখাপড়ায় উন্নত মানের কারণে একসময় ৪০-এর অধিক দেশের ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করত। সুদান, সোমালিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কিছু দেশের শিক্ষকও ছিলেন এখানে। কিন্তু ২০০১ সালের পর থেকে সরকারীভাবে পাকিস্তানের সাধারণ মাদরাসাগুলোতে স্টুডেন্ট ভিসা বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে এখন আর কোন বিদেশী ছাত্র বা শিক্ষক এখানে নেই। এটি পাকিস্তানের একমাত্র মাদরাসা যেটি 'রাবেতাতুল 'আলাম আল-ইসলামী'র সদস্য। সঊদী আরবের বড় বড় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এই প্রতিষ্ঠানের মু'আদালা রয়েছে। এজন্য এখান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়ার পর অধিকাংশ ছাত্র সঊদীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায়। বর্তমানে প্রায় চার'শ ছাত্র পড়াশোনা করছে। আবাসিকতা ও খানাদানা সবই ফ্রী এবং অনেক উন্নতমানসম্পন্ন। প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন ড. রশীদ রানধাওয়া। তবে মাদরাসায় উপস্থিত না থাকায় তাঁর সাথে দেখা হয়নি।

'জামা'আতে মুজাহেদীন পাকিস্তান' কর্তৃক মাদরাসাটি পরিচালিত হয়। এজন্য কৌতূহলবশতঃ আক্বীদাগত বিষয়ে কিছু জানতে চাইলাম। দেখলাম এ ব্যাপারে উনাদের ধারণা খুব পরিষ্কার। প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমের প্রবল বিরোধী হলেও জিহাদের নামে প্রচলিত জঙ্গীবাদ এবং 'তাকফীর' সংক্রান্ত ফিতনা সম্পর্কে তারা পূর্ণ সচেতন, আলহামদুলিল্লাহ।

১০ মিনিটের জন্য এসে ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আমীরুল ভাই তাগাদা দিলেন। উনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জামে'আ ছাত্তারিয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। জামে'আ আবুবকর থেকে খুব অল্প দূরত্ব। সিন্ধু টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ডের পার্শ্ববর্তী করাচী ইউনিভার্সিটি রোডের উপরেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছলাম সেখানে। ঘড়ির কাটায় তখন রাত ১১টা বেজে গেছে। এই সময় কোন প্রতিষ্ঠানে ঢোকা রীতিমত পাগলামী। তবুও দারোয়ানকে জাগিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। প্রবেশমুখেই হাতের ডানে প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ সালাফীর অফিস। মাদরাসার রঈস বা প্রধান হিসাবে এখনও দায়িত্ব পালন করছেন তাঁর বড় ভাই মাওলানা আব্দুর রহমান সালাফী। অশীতিপর এই বৃদ্ধ আলেম এখনও সুস্থ হালাতে বেঁচে আছেন এবং দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। অফিসের সাথেই লাগোয়া মাদরাসার ক্লিনিক এবং পিছনে লাইব্রেরী। ভিতরে লাইট জ্বলছে। লোকজন ছিল হয়ত কিছু। কিন্তু এই রাতে কাউকে চমকে দেয়ার মানে হয় না। তাই ওদিকটায় না গিয়ে চটপট ভিতরে একাডেমিক ও আবাসিক ভবনগুলো দেখে আসলাম। তিনতলা ও দোতলা বিশিষ্ট দুটো বিল্ডিং। আর তার মাঝে উঁচু মিনারবিশিষ্ট বিশাল সুরম্য ইবনে তায়মিয়া মসজিদটা ভিতরে বাইরে সত্যিই দেখার মত। পিছনে খোলা মাঠের মত খালি একটা জায়গা। সেখানে বেশ কয়েকটি গাড়ি পার্কিং করা। তার পিছনে কিছু বাড়ীঘর। আমাদের দেখে মাদরাসার ভিতর থেকে একজন এগিয়ে এল। তার কাছে জানতে পারলাম মাদরাসার প্রাচীর ঘিরে থাকা বাড়ীগুলো মাদরাসাটির দাতা ৫ ভাইয়ের এবং মূলতঃ উনাদের অনুদানে মাদরাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। ৩ তলা ভবনটির উপর তলায় একটা লম্বা সাইনবোর্ড ঝুলছে 'পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি জামে'আ ছাত্তারিয়া ইসলামিয়া'র নামে। সম্ভবতঃ জামে'আ ছাত্তারিয়ার একটি শাখা হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। মাদরাসার আবাসিক ভবনটিতে সবাই তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। এর মধ্যেও ভিতরটা যতটুকু চোখে পড়ল তাতে মনে হল মাদরাসার আবাসিক ব্যবস্থাপনা বেশ উন্নত। সব মিলিয়ে ১৫/২০ মিনিট

অবস্থানের পর বাইরে বেরিয়ে আসলাম। মেইন গেটের পার্শ্বেই প্রস্তর ফলকে মাদরাসা উদ্বোধনকারী হিসাবে কা'বা শরীফের ইমাম শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সুবাইলের নাম লেখা। ১৯৭৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। 'তাওহীদের ডাকে' প্রকাশিত আবক্ষার সাক্ষাৎকারে (মার্চ-এপ্রিল ২০১২) এই প্রস্তরফলকের কথা আগেই পড়েছিলাম।

এবার হোটেলে ফেরার পালা। আমার লাগেজপত্তর সব ওখানেই। গুলশানে ইক্বাল থেকে বেশ দূরের পথ। ইতিমধ্যে শুনশান হয়ে এসেছে করাচী শহর। ঢাকা শহরের তুলনায় এখানকার রাত একটু আগেভাগেই নামে মনে হচ্ছে। আমীরুল ভাই উনার মটর সাইকেলে রেখে আসতে চাইলেন হোটেল পর্যন্ত । আমি না করলাম। একটা সিএনজি ঠিক হল। তারপর উনাকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলাম। এই গভীর রাতে দ্বীনদার, সহজসরল, অতিথিবাৎসল এই মানুষটাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দিব বুঝতে পারছিলাম না। কেবল অন্তর থেকে দো'আ করলাম। কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা নিজের চেয়ে অপরের জন্য সময় দিতেই বেশী আনন্দ পান। আমীরুল ভাই হ'লেন সেই গোছের মানুষ। কাজকাম, বাড়ীঘর ফেলে সেই দুপুর থেকে এত রাত অবধি বেচারা একটানা আমার সাথে ঘুরছেন। বিরক্তির লেশমাত্র নেই। উনি সাথে না থাকলে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এতগুলো স্থানে যাওয়া মোটেও সম্ভব ছিল না। ১৯৮৮ সাল থেকে পাকিস্তানে আছেন। পড়াশোনা শেষ করে বিয়েও করেছেন এখানকার এক বর্মী মুহাজির পরিবারে। উনার শ্বশুর ছিলেন সঊদী আরবের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ আলেম মাওলানা নূরুল বাছীর, যিনি কৌরঙ্গী টাউনের জিয়া কলোনীতে অবস্থিত মা'হাদে আবু যার মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। এ বছর ১৭ই ফেব্রুয়ারী পুলিশের হাতে জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। তারপর গোয়েন্দা অফিসে এই প্রৌঢ় আলেমের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সেখানেই তিনি মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। আমীরুল ভাইয়ের তিন ছেলেমেয়ে মুনীফ, আব্দুর রহমান ও খাদিজা তো আমাকে পেয়ে মহাখুশী। বাংলা না জানলেও বাংলাদেশের প্রতি ওদের টান দেখে অবাক হলাম। সবমিলিয়ে বেশ সুখ-শান্তিতেই আছেন এখানে। তবে আগামী দু'এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশে সপরিবারে স্থায়ীভাবে ফিরে যাওয়ার জন্য খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তার চেয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তার সন্তানরা।

রাত ১২টার পর হোটেলে পৌঁছে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিলাম বিছানায়। মনে মনে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম সংক্ষিপ্ত সফরটি নিরাপদে ও ফলপ্রসূভাবে শেষ করতে পেরে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। করাচী শহর যে এখন কেবল ঐতিহাসিক শহরই নয়, সন্ত্রাসের শহর হিসাবেও সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।

পরদিন ১৫ মার্চ'১৪ সকাল ৮টায় ফ্লাইট। ভোর ৫টায় ডাক পড়ল। বিমানবন্দর পৌঁছে বোর্ডিং কার্ড নেয়ার পর শুনি ফ্লাইট এক ঘণ্টা লেট। বোর্ডিং কার্ড নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি, সেসময় সামনে সাবেক পাকিস্তানী ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরামের মত চেহারাধারী লম্বা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তারপর পিছনে ফিরতে অবচেতনভাবে উনার সাথে সালাম-মুছাফাহা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আর ইউ ইমরান খান'? প্রশ্ন শুনে উনি এবং উনার সহযাত্রী মনে হল বেশ মজা পেলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন। আমিও দ্বিধায় পড়ে বোকা হাসি হেসে বললাম, 'সরি, ইউ লুক জাস্ট লাইক হিম'। পরে দেখি অফিসাররা সবাই তাঁর সাথে হ্যা-শেক করতে ব্যস্ত। আরে, ব্যাপার কি? এতক্ষণে বুঝলাম আমার ভুলটা। 'ওয়াসিম আকরাম'-এর জায়গায় ভুলক্রমে 'ইমরান খান' বলাতেই উনারা হেসে উঠেছিলেন, আসলে উনি ওয়াসিম আকরামই। সেদিন তিনি বাংলাদেশে যাচ্ছিলেন টি-২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের টিভি কমেন্টেটর হিসাবে।

স্থানীয় সময় বেলা ৯টায় বিমান ছাড়ল। ওমানের মাসকাট থেকে আসা ফ্লাইটের অধিকাংশ যাত্রী বাংলাদেশী শ্রমিক। আমার পার্শ্বের সীটে বসেছে ফরিদপুর এলাকার এক শ্রমিক। বয়স ৩০ পার হয়নি। মাসকাটে ৩ বছর থাকার পর দেশে ফিরছে। এত দিন পর দেশে ফিরছে অথচ চেহারায় খুশির কোন চিহ্ন নেই; বরং প্রচ- বিতৃষ্ণার ছাপ। মনে হচ্ছে জোর করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পোশাক-আশাকও সেই রকম। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ না করেই বোধহয় বিমানে উঠেছে। প্রথমে কিছু বলতেই চায় না। পরে একটু চাপ দিতে সজল চোখে বলল 'অনেক টাকা ঋণ করে গিয়েছিলাম মোটা বেতনের লোভে, কিন্তু সবই ভূয়া'। ৩ বছরে অতি কষ্টে ঋণটা শোধ করতে পেরেছে বটে কিন্তু এখন দেশে ফেরার সময় হাতে কোন টাকা নেই। আবার মাসকাট ফিরবে কিনা তাও জানে না। আশেপাশের অন্য যাত্রীদের গল্পও যে খুব একটা ভিন্ন নয় চেহারা-সূরত দেখেই অনুমান করা যায়। এদের দুর্ভোগের চিত্র দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। যে পরিমাণ টাকা খরচ করে এরা বিদেশে গেছে, সে টাকা দেশে বিনিয়োগ করলে অনায়াসেই তারা যথেষ্ট ভালভাবে দিনগুজরান করতে পারত। সরকারের দায়িত্বহীনতায় এবং আদম ব্যাপারীদের খপ্পরে পড়ে প্রতি বছর হাযার হাযার বাংলাদেশী শ্রমিক এভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছে এবং নিরূপায় হয়ে বিদেশের মাটিতে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। কখনও ভাগ্য ফেরাতে অপরাধমূলক কর্মকা- জড়িয়ে পড়ছে। ফলে দুর্নাম হচ্ছে তাবৎ বাংলাদেশীদের। এসব শ্রমিকদের অধিকাংশই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তো দূরের কথা, এমনকি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নও নয়। সহযাত্রীর ইমিগ্রেশন ফর্মটা পূরণ করে দেয়ার পর সামনে পিছনে আরো কয়েকজন যখন এগিয়ে এল ফর্মটা পূরণ করে দেয়ার জন্য, তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল এই দূরবস্থা দেখে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এই নিরক্ষর শ্রমিকদের ঘামের অবদানই সবচেয়ে বেশী বলে শোনা যায়। অথচ এদেরকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষার জন্য কঠোর আইন করা এবং সেই সাথে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কথা ভাবার যেন কেউ নেই। আল্লাহ এদের উপর রহম করুন।

বিমানের ছোট্ট জানালার ওপারে নীল আকাশ জুড়ে অদ্ভুত সুন্দর গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘের সারি পরম আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। বড়ই মুক্ত স্বাধীন জীবন ওদের। ঠিক তার বিপরীতে অন্য রকম এক গুমোট মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে দুর্নীতি ও প্রতারণার ফাঁদে আটকে পড়া বিপর্যস্ত বনু আদমগুলোর ভগ্ন হৃদয়াকাশ। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই শ্রমজীবীদের মুখের দিকে চেয়ে থাকা অসহায় পরিবারগুলোর কথা ভেবে মনটা খুব বিষণ্ন হয়ে উঠে। একসময় রাজধানী ঢাকার আকাশে চলে আসে বিমান। ঠিক বেলা দেড়টার সময় ল্যা- করে প্রিয় স্বদেশভূমিতে। সমস্ত চিন্তা তখন কেন্দ্রীভূত হয় দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাতলাভের আনন্দঘন মুহূর্তটির দিকে। *(চলবে)*

[লেখক : ছাত্র, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

পদ্মায় নৌকা ভ্রমণ : দুঃসহ একটি দিন

-আকরাম হোসাইন

স্মৃতি মন্থনের কারণ :

স্মৃতিটি দুঃসহ বললে মোটেও ভুল হবে না; যদিও সম্মিলিত ভ্রমণের মধ্যে আনন্দের ভাগই বেশী। কিন্তু কখনো কখনো কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনা চূড়ান্ত আনন্দকে সমূলে নাশ করে ফেলে। এমনি একটি দুঃসহ ঘটনা আজ আমি শেয়ার করতে চাই।

আল্লাহ্র কসম! যখনই সেই দিনটির কথা স্মরণ হয় তখনই এক অজানা শিহরণে গা শিউরে উঠে। কী ভয়ঙ্কর সেই দৃশ্য! যা সহজে ভুলতে পারি না; আর ভোলার কথাও না।

গোড়ার কথা :

৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩। আমার অনার্সের ইয়ার চেঞ্জ পরীক্ষা চলছিল। সে দিন পরীক্ষা ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোর্স।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে প্রতিবছর শিক্ষা সফর আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেবছরও সিদ্ধান্ত হয় শিক্ষা সফরের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক দেশের চলমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অনেকের পরীক্ষা আগে-পিছে হতে থাকে, যার দরুন যথাসময়ে শিক্ষা সফরটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু 'যুবসংঘ' রাবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও ইসলামিক স্টাডিজের এম.এ বিভাগের ছাত্র আবু তাহের ভাই জোরালোভাবে মতামত দেন আশে-পাশে হলেও একটি সফরের আয়োজন করার। বিষয়টি বিবেচনা করে সকলের ঐক্যমত্যে সিদ্ধান্ত হয় পদ্মা নদীতে নৌকা ভ্রমণ করার। তারিখও নির্ধারিত হয়।

এটি সকলের জানা কথা, আমাদের প্রতিবেশী (?) দেশ ভারতের কিছু নিষ্ঠুর ও রূঢ় আচরণে আমাদের দেশ এক চরম হ-য-ব-র-ল অবস্থায় দন্ডায়মান। তারা তাদের সুবিধামত ফারাক্কা বাঁধ খোলে আবার বন্ধ করে। যাতে আমাদের দেশের জনগণ প্রচ-ভোগান্তির শিকার হয়, বিশেষ করে পদ্মা পাড়ের মানুষদের।

আগস্ট মাস, মাসের প্রথম দিকে ভারত ফারাক্কা বাঁধ খোলে দেওয়ায় পদ্মা নদীতে প্রচ-রূপে পানি আসতে শুরু করে। পদ্মা নদী হয়ে ওঠে কানায় কানায় পূর্ণ। আশে-পাশের অঞ্চলগুলো পস্নাবিত হতে থাকে; ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। এহেনবস্থায় পদ্মা পাড়ের জনগণদের এক দুঃসহ অবস্থার মোকাবেলা করতে হয়, যা প্রতিবছর হয়ে থাকে।

যাইহোক, ভ্রমণের সময় দেওয়া হয় ৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টা। দুপুরে খেয়ে বের হয়ে ফিরে আসতে হবে সন্ধা ৬টা নাগাদ। আমিও লোভ সামলাতে পারলাম না। এমনিতেই পরীক্ষার জন্য যাব যাব বলেও যাওয়ার সুযোগ হচ্ছিল না। তার উপর আবার সকলে এক সাথে! যদিও ৭ সেপ্টেম্বর আমার পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার সময় ছিল সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত। আমি তাদেরকে রিকুয়েস্ট করি সফরটার সময় ২টা থেকে ৩টা করা হোক। কেননা ভার্সিটির বাস নওদাপাড়াতে দুপুর ২:৩০ মিনিটে পৌঁছায়। আবার ফ্রেশ হওয়া তারপর লাঞ্চের একটা ব্যাপার স্যাপারও আছে। শেষ পর্যন্ত তারা আমার অনুরোধটাকে সম্মতি দেয়।

আল-হামদুলিল্লাহ রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষাটি খুব সুন্দর হয়। একটি ফুরফুরে মেযাজ নিয়ে ফিরছিলাম আর মনের আয়নাতে পদ্মা নদীকে কল্পনার তুলিতে আঁকছিলাম। কিন্তু ভার্সিটির বাস যখন নওদাপাড়াতে এসে পৌঁছায় তখন দেখি ৫/৬টি অটো রিক্সা (ব্যাটারি চালিত যান) রিজার্ভ করা কিছু ছাত্র অটোতে উপবিষ্ট! আমি দ্রুত আবু তাহের ভাইয়ের কাছে গেলাম এবং খুবই আক্ষেপের সুরে তাকে আমার ক্ষোভ প্রকাশ করলাম! তিনি কোন কথা না বলে শুধু মুচকি হেসে উড়িয়ে দিলেন...! আমি কোন রকম চেঞ্জ না হয়েই অটোতে উঠে পড়লাম। হাতে তখনও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, নোট খাতা, স্কেল, ফাইল। সেগুলো নিয়েই যাত্রা শুরু করলাম। তখন আবু তাহের ভাইকে অভিমানের সুরে বললাম, আমার দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে! তিনি এক বাক্যে রাজি হয়ে যান। যদিও পরবর্তীতে তার কোন নাম গন্ধও দেখা যায়নি; অবশ্য সুযোগও ছিল না।

আমরা রাবির ছাত্র ছিলাম ১২/১৫ জন এবং নওদাপাড়া মাদরাসার প্রায় ১৫/২০ জন। মোটামুটি ৩৫/৪০ জনের এক ছোট খাটো বাহিনী! আমরা নদী তীরে পৌঁছেই দেখি এক সীমাহীন জলরাশি। শুধু পানি আর পানি, যার কোন কূল-কিনারা নেই। সাথে তীব্র বিক্ষুব্দ পানির স্রোত, আর নদীর ভয়ঙ্কর তর্জন-গর্জন; মনে হচ্ছিল একটি বিশাল মৃত্যুকূপ ওঁত পেতে আছে। প্রথমে দেখে বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল, যেখানে কিছুদিন আগে দেখেছিলাম ধু-ধু বালুচর, মাঠের পর মাঠ ক্ষেত-খামার, ২ মিনিট সাঁতার কাটলেই ওপাড়ে যাওয়া যেত; এমনকি কোথাও আবার হাটু জলও ছিল! কিন্তু এখন একি অবস্থা! নিজের চোখে না দেখলে লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব।

অতঃপর আমরা একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রিজার্ভ করলাম ওপারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। যদিও মাঝি ভাই বললেন, কোন কূল কিনারা নাই জাস্ট নৌকাতে চড়ে থাকতে হবে। কেননা পানি ভারত পর্যন্ত চলে গেছে; তবে বিজিবি ক্যাম্পে বাঁধ দিয়ে ক্যাম্পের কিছু জায়গা রক্ষা করা হয়েছে। আমরা বললাম, আমরা শুধু নৌকাতেই থাকব, আর দয়া করে বিজিবি ক্যাম্পে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিয়ে যেতে হবে। তিনি প্রথমে রাযী হচ্ছিলেন না। কারণ ওটা অনেক দূরে প্রায় আধা ঘন্টার পথ। আমাদের জোরাজুরিতে অবশেষে রাযী হোন।

স্মৃতির প্রাথমিক পর্ব :

আমরা সকলে নৌকাতে চড়ে বসলাম। নৌকাটি রিজার্ভ করতে কত টাকা লেগেছিল ঠিক মনে নেই; তবে জনপ্রতি সম্ভবত ৩০/৪০ টাকার বেশী লাগেনি। তবে এ বিষয়ে সকলে একমত হতে কার্পণ্য করবে না যে, আমরা যত সময় নৌকাতে অবস্থান করছিলাম তাতে জনপ্রতি ১০০ টাকা হলেও কেউ অমত করত না। ৩:৩০ মিনিটে নৌকাতে উঠি আর নদীর এপারে ফিরে আসি প্রায় ৬:৩০ মিনিটে। নৌকাতে থাকা অবস্থায় এক অন্য ধরণের অনুভূতি কাজ করছিল। চতুর্দিকে কাদামাটি মিশ্রিত পানির উপর দিয়ে ভট ভট আওয়াজ তুলে নৌকাটি এগিয়ে যাচ্ছিল। স্রোত দেখে মনে হচ্ছিল কিছুটা খুলনার মোংলা পোর্টের পশুর নদীর মত। অতঃপর মাঝপথে গিয়ে এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখে রীতিমত আনন্দে নেচে উঠার উপক্রম। চতুর্দিকে ধনচি গাছের মত এক প্রকার উদ্ভিদ স্রোত ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন

বসন্তের মৃদমন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তাদের সারা শরীরে। পানি পেয়ে তারা যেন আনন্দে আত্মহারা। আশে পাশে শ্যাওলার ভেসে বেড়ানো দৃশ্য সেই ছোট্টবেলার নদীতে উল্টা হয়ে সাঁতার কাটার কথাই মনে করিয়ে দেয়। সত্যিই এক মনমুগ্ধকর পরিবেশ! এভাবে আশে-পাশের নতুন নতুন দৃশ্য উপভোগ করতে থাকি। আর চিন্তা করি, হায়রে পদ্মা নদী! তোমার বুক চিরে নৌকা ভ্রমণ করতে কতই না আনন্দের; কিন্তু তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? তোমার স্রোতের হিংস্রতায় কত অসহায় মানুষ তোমার গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এতে তোমার একটুও মায়া হয় না!

অন্যদিকে আবার মনের মধ্যে যে এক ধরণের ভীতি কাজ করছিল, যা অস্বীকার করা যাবে না। মনে মনে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনাও করতে থাকি। আমরা অনেকে এ অবস্থায় নিজেদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আনন্দ শেয়ার করতে থাকি। আমার মত অনেকেরই ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হয়। আমার আম্মা শুনেতো কেঁদেই ফেলেন। তিনি বলেন, 'এই ভরা নদীতে সফরের কী দরকার ছিল? যদি কোন অঘটন হয়ে যায়'? আমি শুধু বলেছিলাম, এখনতো নদীর মাঝপথে, ইচ্ছা করলেইতো আর ফিরতে পারব না; বরং আমাদের জন্য দু'আ করেন, আমরা যেন ঠিকমত ফিরে আসতে পারি। ইনশাআল্লাহ কিছু হবে না।

অসহায় মানুষগুলোর মানবেতর জীবন-যাপন :

আমরা বিজিবি ক্যাম্পের কাছাকাছি স্থানে দেখলাম, আশে-পাশের গ্রামগুলো সবই পস্নাবিত হয়েছে। ফসলী জমি, ডুবা-অর্ধডুবা ছোট বড় ঘর-বাড়ি, কিছু কিছু ঘর-বাড়ির শুধু চালা দেখা যাচ্ছে। অনেকে নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। অনেককে দেখলাম, ঘরের চালা বা বড় বড় মাচান করে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরকে দেখে অজান্তেই ডুকরে কেঁদে উঠল মন। সফরের আনন্দটি যেন নিমেষে বিসাদে ভরে উঠল। আমরা এসেছি আনন্দ করতে। আর এরা কতইনা কষ্টের সাথে দিনাতিপাত করছে। তাদের অনেকের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম, তাদের নিদারুন দুঃখ-কষ্টের কথা। কেউ নিজ ভিটা হারিয়েছে, কেউ ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র হারিয়েছে। আবার অনেকে একদম সর্বহারা হয়ে গেছে। তাদের মানবেতর জীবন-যাপন দেখলে একজন সুস্থ মানুষের বিবেক অবশ্যই নাড়া দিবে। অবশ্য আমরা পরবর্তীতে আমাদের সাধ্যমত সাংগঠনিকভাবে দফায় দফায় ত্রাণ-তহবীল তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আল-হামদুলিল্লাহ।

নদীবক্ষে একখ- দ্বীপ : বিজিবি ক্যাম্প

স্রোতের কারণে ৩০ মিনিটের জায়গায় প্রায় ৪০/৪৫ মিনিট পর আমরা বিজিবি ক্যাম্পে পৌঁছি। মূল নদী থেকে প্রায় আধা কিঃমিঃ দূরে ক্যাম্প। তবুও মনে হচ্ছিল, এটি নদীর মাঝখানে জেগে ওঠা একটি দ্বীপ। কেননা আশে-পাশের এলাকাগুলো সবই পদ্মার হিংস্র গ্রাসে পরিণত হয়েছে। তাই ক্যাম্পটিকে কোন রকম শক্ত বাঁধ দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। মাঝি এখানে একটি বড় গাছের সাথে নৌকাটি বেঁধে দেন। নীচে নেমে প্রথমেই আমরা স্থানীয় মানুষ এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করলাম। অতঃপর আমরা ক্যাম্পটি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম তাদের অনুমতিক্রমে। কেউ তখন বিজিবি সদস্যদের সাথে বিভিন্ন আলাপচারিতায় ব্যস্ত, কেউ পদ্মার পানিতে পস্নাবিত এলাকার ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো ক্যামেরাবন্দীতে ব্যস্ত। কেউবা আবার দুঃখমিশ্রিত আনন্দে নদীর পানিতে গোসলে ব্যস্ত।

পদ্মার স্রোতে সাঁতার কাটার আনন্দঘন মুহূর্ত :

কিছুক্ষণ পর দেখি মাদরাসার ছোট-বড় ছাত্রদের সাথে আমার কিছু বন্ধুরাও তাদের সাথে নদীর পানিতে গোসল করছে, সাঁতার কাটছে, লাফালাফি করছে। তারা পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক লুঙ্গি, গামছা সঙ্গে এনেছিল। তাদের আনন্দ দেখে আমারও খুব ইচ্ছা হচ্ছিল পানিতে নামতে! কিছুতেই তর সইছিল না। কিন্তু কি আর করার আমিতো সঙ্গে লুঙ্গি-গামছা নিয়ে আসেনি। শুধুই তাদের লাফালাফি উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ যাকারিয়া নামের এক মাদরাসার ছাত্র আমাকে বলল, 'আকরাম ভাই পানিতে নেমে পড়েন খুব মজা!' আমি বললাম, 'আমিতো সঙ্গে অতিরিক্ত কাপড় আনিনি। একজন তার ব্যাগ থেকে আমাকে লুঙ্গি দিতে চাইলে আমি আর লোভ সামলাতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে পোশাক চেঞ্জ করে পানিতে নেমে পড়লাম। প্রায় ৮/৯ বছর আগে একবার মামার সাথে নদীতে গোসল করেছিলাম। দীর্ঘদিন পর এটি ছিল দ্বিতীয় বার। চেঞ্জ হয়ে দ্রম্নত পানিতে নেমে পড়লাম। কি যে আনন্দ! ভুলেই গিয়েছিলাম দুনিয়ার সব চিন্তা-ভাবনা। মনে হচ্ছিল এক নতুন জগৎ, সীমাহীন আনন্দের উচ্ছাস এসে যেন জড়িয়ে ধরতে চাইছে। ভেসে থাকতে ইচ্ছে করছে পদ্মার পানিতে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই নদীতে গোসল করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু আমার একদমই ছিল না। পশ্চিম দিক থেকে একটি স্রোত আসছিল; সম্ভবত ভারত থেকে হবে, যা সোজা নদীতে চলে যাচ্ছে। অনেকেই সেই স্রোতে গা এলিয়ে দিচ্ছে, তাদের দেখা দেখি আমিও গা এলিয়ে দিলাম, দেখি খুব দ্রম্নতগতিতে নদীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু ৩/৪ সেকেন্ড পরই আমি সম্বিত ফিরে পেলাম! হঠাৎ মনে হল, আমিতো নদীর দিকেই চলে যাচ্ছি। সাথে সাথ নিজেকে কন্ট্রোল করলাম এবং ধারে এসে উপরে উঠে পড়লাম। পোশাক চেঞ্জ করতে করতে ভাবছিলাম, আমি এতই বোকামি করছিলাম যে, এই স্রোতে আমি গা এলিয়ে দিয়েছিলাম! এটা কি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত যে স্রোত আমাকে দূরে নিয়ে যাবে আবার তীরে ফিরিয়ে আনবে? এমনিতেই আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই নদীতে গোসলের, যদিও পুকুরে সাতার কাটতে পারি। আমি উঠে আসার পরও দেখি অনেকে সেই স্রোতে ভাসছে।

দুঃসহ সেই ঘটনা :

৫/৭ মিনিট পর দেখি মাদরাসার দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র ও বিনোদনপ্রিয় আব্দুল হাকীম স্রোতে গা এলিয়ে অনেক দূরে চলে যায়। তার সাথে আরো কয়েকজন থাকলেও তারা বেশীদূর না গিয়ে ফিরে আসে; কিন্তু সে ফিরে আসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়; ততক্ষণে সে মূল নদীতে চলে গেছে। হঠাৎ স্রোত যখন পাক দেয় এবং সে ঝাঁকি খায়, তখন বুঝতে পারে সে অনেক দূরে চলে গেছে। তখন সে ফিরে আসার চেষ্টা করে; কিন্তু যতই সামনে আসার চেষ্টা করে ততই সে পিছনে সরে যায়। যখন দেখল সে আর পারছে না, তখন চিৎকার দিতে শুরু করে। আমরা সবাই চিৎকারে তার দিকে দৃষ্টি ফিরায়। হতচকিয়ে তার অবস্থা দেখে সবাই নিঃস্তব্ধ, অসহায়ের মত দেখা ছাড়া মনে

হচ্ছিল কিছুই করার ছিল না। একদিকে বিক্ষুব্ধ স্রোত, অন্যদিকে বেঁচে থাকার লড়াই! কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞানটুকু লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কেউ চিৎকার দিয়ে বলছে, গা এলিয়ে দাও, কেউ বলছে স্রোতের দিকে ফিরে আসার চেষ্টা কর না; বরং স্রোতের ডানে বা বামের দিকে যাওয়ার চেষ্টা কর। এদিকে মাঝিকে ডেকে আনার জন্য কেউ দৌড় দিচ্ছে। তার চিৎকারের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কাউকে কিছু না বলেই তারই ক্লাসমেট মামুন, সাখাওয়াত ও হাসান তাকে উদ্ধারের জন্য গেল; কিন্তু হল তার বিপরীত! তারা চেয়েছিল, তারা তার হাত ধরবে, ফলে সে সাঁতার কেটে ফিরে আসবে। কিন্তু আব্দুল হাকীম অবুঝের মত তাদের কারো ঘাড়ে অথবা মাথার উপর ওঠে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকে, যার কারণে তারা সকলেই ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এই কারণে তারাও কেউ কেউ পানির নীচে তলিয়ে যাচ্ছিল, কারো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। যদিও পরে তারা ফিরে আসতে সক্ষম হয়। আব্দুল হাকীমেরও তখন কোন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। আর থাকার কথাও না।

অবশেষে মুক্তি :

এমতাবস্থায় হঠাৎ এক স্থানীয় লোক নৌকাতে রাখা বড় পানির জারকিন নিয়ে নদীতে নেমে পড়ল এবং তাদের কাছে পৌঁছে আব্দুল হাকীমকে জারকিন ধরিয়ে দিল। এতক্ষণে সে হাফ ছেড়ে বাঁচলো! তারপর সে স্রোতের এক পার্শ্বে গিয়ে ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। আল-হামদুলিল্লাহ।

শ্বাসরুদ্ধকর এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে মনে হল, আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে তার জীবন রক্ষা করলেন। সে নব জীবন লাভ করল। পরবর্তীতে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ও স্থানীয় ঐ লোকের জন্য প্রাণখোলা দো'আ করে গন্তব্যের দিকে ফিরে আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। ফেরার পথে সকলেই ছিল এক ধরণের নিঃস্তব্ধ ও নিথর। কথা বললেও খুবই কম। যাওয়ার পথে যে আনন্দ করছিলাম ফিরে আসার পথে তার লেশমাত্র ছিল না। সব আনন্দই যেন এই নিষ্ঠুর পদ্মা এক মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বিশেষ করে আব্দুল হাকীম সম্পন্ন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কারো সাথে কোন কথা না বলে চুপচাপ শরীর নৌকাতে এলিয়ে দেয়। আমরা তাকে তখন বেশী কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি।

মাদরাসাতে ফিরলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে, সে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলে যেটুকু সেন্সে ছিল। তার সকল কথার মধ্যে বিশেষ একটি কথা ছিল, 'আল-হামদুলিল্লাহ আমি একটা সম্পূর্ণ নতুন জীবন ফিরে পেলাম'।

পরিশেষে বলতে চাই, আমার জীবনে এমন ঘটনা স্ব-চক্ষে কখনো দেখিনি। চোখের সামনে একজন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হলে কিভাবে সে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে বাস্তব এই দৃশ্য না দেখলে হয়ত বুঝতে পারতাম না। হাতের কাছে যা পায় তাই ধরে বাঁচার জন্য চেষ্টা, একটি খড়-কুটা হলেও। যখনই সেই স্মৃতি মনের আয়নায় ভেসে উঠে তখন অন্তত কিছুটা হলেও, কিছু সময়ের জন্য হলেও মনটা ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ঈমান বৃদ্ধি পায় এটা একদম সত্য কথা।

[লেখক : তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ ও দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

রামাযান সংক্রান্ত যরূরী দো'আ সমূহ

(১) নতুন চাঁদ দেখার দো'আ :

اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِماَ تُحِبُّ وَ تَرْضَي رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি ওয়াসাসালা-মাতি ওয়াল ইসলাম-মি, ওয়াততাওফীক্বি লিমা তুহিব্বু ওয়া তারযা; রব্বুনা ওয়া রব্বুকাল্লা-হ। **অর্থ :** 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সাতে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সাতে এবং আমাদেরকে ঐ সকল কাজের ক্ষমতা দানের সাতে, যা আপনি ভালবাসেন ও যাতে আপনি খুশি হন। (হে চন্দ্র!) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২৮, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮১৬)*।

(২) ইফতারের দো'আ : ছায়েম بسم الله 'বিসমিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি) বলে ইফতার শুরু করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯)*। উল্লেখ্য, সমাজে ইফতারের একটি দো'আ আছে, যা যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩৫৮)*। দো'আটি নিম্নরূপ : اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ।

(৩) ইফতার শেষের দো'আ : ছায়েম ইফতার শেষে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ 'আল-হামদুলিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) বলবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০)*। তবে অন্য আরেকটি দো'আ পড়া যায়। যেমন- ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ' (তৃষ্ণা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার নিশ্চিত হল *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩, সনদ হাসান)*।

(৪) লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : রাসূল (ছাঃ) লায়লাতুল ক্বদরের রাত্রিগুলোতে বেশী বেশী যে দো'আটি পড়তে বলেছেন সেটি হল اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى: (আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী) অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতে ভালবাসেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৯১, সনদ ছহীহ)*।

(৫) সাইয়েদুল ইস্তেগফার :

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু। আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি আপনার দাস। আমি আমার সাধ্যমত আপনার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে আপনার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫)*।

(৬) সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো'আ : بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ– (বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইউং ফিল্ আরযি ওয়া লা- ফিস্-সামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম) **অর্থ :** 'আমি ঐ আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, যার নামে আরম্ভ করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তাহ'লে কোন বালা-মুছীবত তাকে স্পর্শ করবে না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৯১)*।

প্রশ্নোত্তর

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

[নব্য জাহেলিয়াতের দুর্গন্ধযুক্ত ময়দানে পাঠক মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। মস্তিষ্ক প্রসূত বিভিন্ন মতবাদ বিক্ষুব্ধ সমাজ আজ বিজাতীয় সভ্যতার আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ধর্মের নামে বিভিন্ন চরমপন্থী দলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মিথ্যা ইতিহাসের বেসাতীতে মুসলিম সমাজ আজ অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। পাশ্চাত্যমনা একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের তথাকথিত টকশো ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ডামাডোলে প্রকৃত ইতিহাস আজ ভিন্নখাতে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই 'তাওহীদের ডাক'-এর 'প্রশ্নোত্তর' কলামের মাধ্যমে আমরা এমন কিছু বিষয়ের 'প্রশ্ন ও উত্তর'পাঠকদের নিকট উপস্থাপন করব, যা সত্য ইতিহাসকে করবে উন্মোচিত এবং মিথ্যাকে করবে পদদলিত। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিভাগে ইসলাম, সংগঠন, আধুনিক বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করবে। এমর্মে সুপ্রিয় পাঠকদের নিকটে প্রশ্ন আহ্বান করা যাচ্ছে। সহকারী সম্পাদক।]

প্রশ্ন (১/১) : গণতন্ত্র কী? ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক দিকগুলো কী কী?

-মেহেদী হাসান
এম.এ, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর : গণতন্ত্রের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Democracy. Democracy শব্দটি দু'টি গ্রীক শব্দ Demos ও Kratia থেকে উদ্ভূত। Demos শব্দের অর্থ হল 'মানুষ/জনগণ' এবং Kratia অর্থ পরিচালনা। তাই Democracy এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য আইন তৈরী করে তাদের নিয়োগকৃত স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা। কোন আইন ও নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। অতীতে ও মধ্যযুগে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিপরীতে জনগণের শাসন ব্যবস্থা হিসাবে এটিই ব্যবহৃত হত। আধুনিক যুগে এটি একটি সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে বুঝানো হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় শাসনব্যবস্থা।

আমেরিকার খ্রিষ্টান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincohn) ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় 'গণতন্ত্র' (Democracy) নামে একটি রাষ্ট্রিক মতবাদের রূপরেখা পেশ করেন। তিনি বলেন, Democracy is the government of the people by the people and for the people. অর্থাৎ 'গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা মানুষের উপর মানুষের দ্বারা পরিচালিত মানুষের প্রভুত্বভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়'।

অধ্যাপক সিলী (Prof. Selley) বলেন, Democracy is a form of government in which every one has a share in it. অর্থাৎ 'যে সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে'।

গণতন্ত্র ইসলাম বিরোধী একটি ত্বাগূতী মতবাদ। এই শিরকী মতবাদ আল্লাহ্র বান্দাকে দ্বীনহীন করে দেয়। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলো থেকে ইসলাম সমূলে উৎখাত করে। মূলতঃ এটি ধর্ম নিরপক্ষেতাবাদেরই প্রতিধ্বনি।

ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক দিক সমূহ :

(১) গণতন্ত্র মানবরচিত ধর্ম আর ইসলাম মহান আল্লাহ্র অভ্রান্ত সংবিধান।

(২) গণতন্ত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতই চূড়ান্ত। কিন্তু ইসলাম সংখ্যা গরিষ্ঠতার তোয়াক্কা করে না। আল্লাহ্র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

(৩) গণতন্ত্রে হালাল-হারামের মালিক জনগণ। পক্ষান্তরে ইসলামে হালাল-হারামের বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ।

(৪) গণতন্ত্রে আইন রচনা করে মানুষ। কিন্তু ইসলামী আইন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

(৫) গণতন্ত্রের আইন সর্বদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু ইসলামের আইন অপরিবর্তনীয়।

(৬) গণতন্ত্রে মানুষ মানুষের গোলামী করে। পক্ষান্তরে ইসলামে মানুষ আল্লাহ্র গোলামী করে।

প্রশ্ন (২/২) : সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত মানাক্বিব জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ বিন এরশাদ
বিনেরপোতা, সাতক্ষীরা

উত্তর : সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) ছিলেন একজন জালীলুল ক্বদর ছাহাবী। ইসলাম গ্রহণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি *(বুখারী হা/৩৭২৬)*। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাত দিন পর্যন্ত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি *(বুখারী হা/৩৭২৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থেকে যে সমস্ত ছাহাবী যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধাবস্থায় গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করেছেন সা'দ (রাঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম *(বুখারী হা/৩৭২৮)*। পৃথিবীর ইতিহাসে নবী করীম (ছাঃ) শুধুমাত্র সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে উৎসর্গ করেছিলেন ارْمِ فِدَاكَ أَبِى وَأُمِّى *(বুখারী হা/৩৭২৫)*।

সা'দ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মূর্তপ্রতীক ছিলেন। তিনি সবসময় নির্জনতা বেশী ভালবাসতেন। হাদীছে এসেছে, একদা সা'দ (রাঃ) তাঁর উটের পালের মাঝে বসে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর পুত্র ওমর এসে সেখানে পৌঁছেলেন। তাকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, 'আমি এ আরোহীর অনিষ্ট হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই'। অতঃপর সে তার সওয়ার থেকে নেমে বলল, আপনি লোকদেরকে ছেড়ে দিয়ে উট এবং বকরীর মাঝে বসে আসেন। আর ওদিকে নেতৃত্ব নিয়ে লোকেরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত। এ কথা শুনে সা'দ তার বুকে আঘাত করে বললেন, চুপ থাক। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, 'মুত্তাক্বী, আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি ও লোকালয় হতে নির্জনে বসবাসকারী বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা বেশী ভালবাসেন' *(মুসলিম হা/৭৬২১)*।

মদীনায় হিজরতের পর রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (হিজরতের পর) একদিন রাতে রাসূল (ছাঃ) ঘুমের পূর্বে বললেন, আমার ছাহাবীগণের মধ্যে কোন ছালেহ ব্যক্তি (যদিও সকল ছাহাবী সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ) যদি আজ রাতে আমাকে পাহারা দিত (তাহলে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতাম)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা তখন (দরজার বাইরে) অস্ত্রের ঝনঝনানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কে? উত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ); আপনার পাহারা দেওয়ার জন্য এসেছি। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) এমন

নিশ্চিন্তে ঘুমালেন যে, আমি তাঁর নাকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম' *(মুসলিম হা/৬৩৮৩ ও ৬৮৮৫)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : ই-মেইল কী? এটির ব্যবহার ও উপকারিতা বর্ণনা করুন।

-সাখাওয়াত হোসাইন
চককাযিযিয়া, তানোর, রাজশাহী

উত্তর : ই-মেইল তথা ইলেকট্রোনিক মেইল হল ডিজিটাল বার্তা, যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পাঠানো হয়। ১৯৭০ সালের দিকে 'র‍্যামন স্যামুয়েল টমলিনসন' লেটেক্স অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে লোকাল ই-মেইল সিস্টেম উদ্ভাবন করেন। ১৯৭২ সালের শুরুতে পৃথিবীর প্রথম মেইল পাঠান কম্পিউটার প্রকৌশলী রে টমলিসন। পরবর্তী সময় ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন মেইলিং সিস্টেম ও স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ই-মেইল সার্ভারগুলো মেইল গ্রহণ করে এবং সংরক্ষণ করে পরে পাঠায়। ব্যবহারকারী বা প্রাপককে অনলাইনে থাকার প্রয়োজন হয় না, শুধু সচল ই-মেইল ঠিকানা থাকলেই হয়। একটি ই-মেইলের প্রধানত দু'টি অংশ থাকে, ই-মেইল হেডার ও মেইল বডি। আরএফসি ২০৪৫ থেকে ২০৪৯-এর পাঠানোর প্রক্রিয়ায় ই-মেইল এখন মাল্টিমিডিয়াও পাঠানো যায়। এই আর এফসিকে এমআরইএমই বলে, যার অর্থ হল মাল্টিপারপাস ইন্টারনেট মেইল এক্সটেনশন।

অর্পানেটে নেটওয়ার্কভিত্তিক ই-মেইলগুলো প্রথমে বিনিময় হত এফটিপি (ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল) দিয়ে বিনিময় করা হয়, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। মানুষ সরাসরি কিংবা ইন্টার-অ্যাকটিভ কোন ভয়েস সিস্টেমে যেকোনো বিষয়কে যতটা না সাজিয়ে উপস্থাপন করতে পারে, তার চেয়ে ই-মেইলে অনেক ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারে। অন্যান্য কমিউনিকেশন সিস্টেমের তুলনায় এটি একেবারেই সস্তা হলেও একটি মানসম্পন্ন কমিউনিকেশন সিস্টেম। প্রাপকের সাময়িক অনুপস্থিতি কিংবা ব্যস্ততা এই ই-মেইল কমিউনিকেশন সিস্টেমে কোন বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে না। এটি হচ্ছে একটি দ্রুতগামী ও নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থা।

প্রশ্ন (৪/৪) : ওমর (রাঃ) একজন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন মর্মে ঘটনাটি কি সঠিক?

-মেছবাহুল আলম জুয়েল
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, বাংলাক্যাট, আশুলিয়া, ঢাকা।

উত্তর : সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার যে কাহিনী উল্লেখ করা হয় তা বানোয়াট ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। মূল ঘটনা হল, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর এবং একজন আনছারী ব্যক্তির সাথে খেজুর বাগানে পানি দেয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়। সমাধানের জন্য তারা উভয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গেলে আগে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে পানি নিতে বলে। তখন আনছারী ব্যক্তি রেগে যান এবং বলেন, আপনার ফুফাত ভাই তাই তার পক্ষে রায় দিলেন? তখনই রাসূল (ছাঃ) রাগান্বিত হন এবং তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে যায়। এ সময় উক্ত আয়াত নাযিল হয় *(বুখারী হা/২৩৫৯)*। এখানেই উক্ত ঘটনার সমাপ্তি।

উল্লেখ্য যে, এক মুসলিম আর একজন ইহুদীর মাঝে দ্বন্দ্ব লেগেছিল এবং রাসূল (ছাঃ) ইহুদীর পক্ষে রায় দিলে মুসলিম ব্যক্তি তাকে ওমর (রাঃ)-এর কাছে নিয়ে যায় হক্ব বিচার পাওয়ার জন্য। ওমর (রাঃ) ঘটনা শুনার পর মুসলিম ব্যক্তিকে তরবারি দ্বারা হত্যা করেন। উক্ত সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। উক্ত মর্মে যে ঘটনা প্রচলিত আছে তা মিথ্যা ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী।

প্রশ্ন (৫/৫) : ফেরাউনের লাশ কখন এবং কোথায় পাওয়া গেছে?

-তানভীর আহমাদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : 'ফেরাউন' কোন ব্যক্তির নাম নয়। বরং এটি হ'ল তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি। ক্বিবতী বংশীয় এই সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী মিসর শাসন করেন। এই সময় মিসর সভ্যতা ও সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। লাশ মমিকরণ, পিরামিড (PYRAMID) স্ফিংক্স (SPHINX) প্রভৃতি তাদের সময়কার বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রমাণ বহন করে। মূসা (আঃ)-এর সময়ে পরপর দু'জন ফেরাউন ছিলেন। সর্বসম্মত ইসরাঈলী বর্ণনাও হল এটাই এবং মূসা (আঃ) দু'জনেরই সাক্ষাৎ লাভ করেন। লুইস গোল্ডিং (LOUIS GOLDING)-এর তথ্যানুসন্ধানমূলক ভ্রমণবৃত্তান্ত IN THE STEPS OF MOSSES, THE LAW GIVER অনুযায়ী উক্ত 'উৎপীড়ক ফেরাউন'-এর (PHARAOH, THE PERSECUTOR) নাম ছিল 'রেমেসিস-২' (RAMSES-11) এবং ডুবে মরা ফেরাউন ছিল তার পুত্র মানেপতাহ (منفطه) বা মারনেপতাহ (MERNEPTAH)।

লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে তিনি সসৈন্যে ডুবে মরেন। যার 'মমি' ১৯০৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে 'জাবালে ফেরাউন' নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই ফেরাউনের লাশ প্রথম পাওয়া যায় বলে জনশ্রুতি আছে। গোল্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'থেব্‌স' (THEBES) নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়, যাতে মারনেপতাহ-এর আমলে কীর্তি সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ (SIR CRAFTON ELLIOT SMITH) মমিগুলো খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাউন মারনেপতাহ-এর লাশ শনাক্ত করেন। ঐসময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। এ কারণে যে, অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি। উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। যেখানে আল্লাহ বলেছিলেন যে, 'আজকে আমরা তোমার দেহকে (বিনষ্ট হওয়া থেকে) বাঁচিয়ে দিলাম। যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হ'তে পার'... *(ইউনুস ১০/৯২)*। বস্তুতঃ ফেরাউনের লাশ আজও মিসরের পিরামিডে রক্ষিত আছে। যা দেখে লোকেরা উপদেশ হাছিল করতে পারে। মূসা ও ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ–إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

'আমরা আপনার নিকটে মূসা ও ফেরাউনের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে সত্য সহকারে বর্ণনা করব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য'। নিশ্চয় ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং তার জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যকার একটি দলকে সে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত ও কন্যা সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখত। বস্তুতঃ সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(ক্বাছাছ ২৮/৩-৪) (ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী ২/১০-১১ পৃঃ)*।

দুবাইয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের নতুন রেকর্ড

গত কয়েক মাসে দুবাইয়ে বসবাসরত এক হাযারেরও বেশি অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। যা এদেশে ধর্ম গ্রহণের হারে বিদেশীদের মধ্যে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে দুবাইয়ে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার নাটকীয় হারে বেড়েছে। এই বছরের (২০১৪) গোড়ার দিক থেকে প্রতিদিন শত শত অমুসলিম ব্যক্তি 'দারুল বার ইসলামী তথ্যকেন্দ্র'-এ এসে তা পরিদর্শন করেছেন।

এই কেন্দ্রের পরিচালক রশীদ বলেন, দুবাইয়ে গত জানুয়ারী মাসে কেবল এই কেন্দ্রে এসে ২০৫ জন ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছেন। আর এই কেন্দ্রের বাইরেও আরো অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, যা সম্ভবত এই মাসেই সবচেয়ে বেশি। তিনি আরো জানান, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ২৩৮ জন, মার্চে ২৩৭ জন, এপ্রিলে ৩৮৩ জন দুবাইয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন অনুষ্ঠিত হওয়া আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনেই ২৫০ জন ইসলাম গ্রহণ করেন।

কেন ব্যাপক হারে অমুসলিমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে আজ-জানিব বলেন, 'যে বিষয়টি অমুসলিমদের ইসলামের দিকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করছে তা হল, মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতা, একনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা'।

তিনি আরও বলেন, আমরা এই কেন্দ্রে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। 'দারুল বার ইসলামী তথ্যকেন্দ্রে'র একজন কর্মকর্তা বলেছেন, (চলতি বছরে এখনো প্রায় সাড়ে ৭ মাস বাকি থাকতেই) দুবাইয়ে গত মে মাসের গোড়া পর্যন্ত মুসলিম হয়েছেন ১০৬৩ ব্যক্তি। ২০১২ সালে এখানে মুসলিম হয়েছেন ১০৯৭ জন, আর ২০১৩ সালে ইসলাম গ্রহণের হার দশ শতাংশ বেড়ে ২১১৫ জনে পৌঁছে। ২০১১ সালে দুবাইয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন ১৩৮০ জন, ২০১০ সালে ১৫০০ জন এবং ২০০৯ সালে ১০৫৯ জন। যারা মুসলিম হচ্ছেন তারা প্রধানত ফিলিপাইন, চীন, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ক্যামেরুন, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, জার্মানি, ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মিয়ানমার, সিরিয়া, জর্দান ও ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোর নাগরিক।

ফ্রান্সে বিদায় খ্রিষ্টধর্ম, স্বাগত ইসলাম

গত ২৫ বছরে ফ্রান্সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের হার দ্বিগুণ বেড়েছে। গত ১০০ বছরে ফ্রান্সে যতগুলো ক্যাথলিক গির্জা নির্মিত হয়েছে, গত ৩০ বছরেই তার চেয়ে বেশি মসজিদ তৈরি হয়েছে। ইসরাইল ন্যাশনাল নিউজে 'Catholic France, Adieu; Welcome Islam' শিরোনামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের সিন নামক যেলায় ৫০০ লোক বাস করে। গত সপ্তাহে প্রতি আধা ঘণ্টা পরপর এখানকার 'বয়েসেটস গির্জা'র ঘণ্টা বাজত। কিন্তু প্রশাসনিক আদালত সেই ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ করে দেয়া। কারণ ১৯০৫ সালের ফরাসী আইনে রাষ্ট্র ও গির্জাকে আলাদা করা হয়েছে।

এই অবস্থা বর্ণনা করার জন্য ১০ বছর আগে ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ডেনিয়েল হার্ভেউ লেগার তার 'ক্যাথোলিসজ, লা ফিন দুন মদেঁ' গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন এক্সকালচারেশন (Exculturation) শব্দটি। এর অর্থ হচ্ছে লড়াই এখনো শুরু না হলেও খেলা শেষ। এটা দ্বারা তিনি ফরাসী ক্যাথোলিক ধর্মকে বুঝিয়েছেন।

পৃথিবীর স্পটলাইট থেকে বহু বছর আগেই হারিয়ে গেছে ফ্রান্স। 'গির্জা কন্যা' নামে পরিচিতি দেশটির পূর্বের অবস্থা এখন আর অবশিষ্ট নেই। রাষ্ট্রীয় সেক্যুলারিজম বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের কোপানলে ক্যাথোলিক ফ্রান্স নৈতিকভাবে এখন মৃতপ্রায়। বিশিষ্ট লেখক রেনাল্ড কেমাস 'বয়েসেটসে'র প্রসঙ্গে স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'সেক্যুলারিজম হচ্ছে মুসলিম বিজয়ীদের 'ট্রজান হর্স'। আর ট্রজান হর্স অর্থ সাহসী যোদ্ধার ঘোড়া অথবা যে কাঠের ঘোড়ায় লুকিয়ে গ্রিকরা ট্রয়নগরী দখল করেছিল।

ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম নেতা দালিল বুবাকিউর বলেছেন, 'ফ্রান্সে মসজিদের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৪০০০-এ উন্নীত করা হবে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই অন্তত ৬০টি ক্যাথলিক গির্জা বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলোর বেশ কয়েকটা মসজিদে রূপান্তরিত করা হবে'।

জনসংখ্যার তাত্ত্বিক বিচারে ফ্রান্সে ইসলামই বিজয়ী। ফ্রান্সে প্রতি অমুসলিম পরিবারে শিশুর সংখ্যা ১.২। কিন্তু মুসলিম পরিবারে শিশুর সংখ্যা এর ৫ গুণ বেশি। প্যারিসের প্রধান ধর্মগুরু আর্চবিশপ মনসিঙ্গর ভিঙ্কট ট্রয়েস বলেন, 'আগে ফ্রান্সের গ্রামবাসী প্রতি রবিবার গির্জায় যেত। এখন যায় প্রতি দু'মাসে একবার। তাই গির্জাগুলোর তিন চতুর্থাংশই খালি পড়ে থাকে'। ফ্রান্সের মত একই অবস্থা পুরো ইউরোপের। বর্তমানে প্রতি ২০ জন ফরাসী নাগরিকের একজন ধর্মকর্ম পালন করেন। আছে যাজক সংকটও। ফরাসী যাজক না পাওয়ায় এখন তাদের স্থান দখল করছেন আফ্রিকার যাজকরা।

অন্যদিকে ফ্রান্সে যাজকের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯০০০-এ। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যাজকের সংখ্যা ছিল ৪০ হাযার। ২০০০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শিশুদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের হার ২৫ শতাংশ কমেছে। ধর্মীয়ভাবে বিয়ের হার কমেছে ৪০ শতাংশ। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৬৫ সালে ফ্রান্সের ৮১ শতাংশ মানুষ নিজেকে ক্যাথলিক বলে পরিচয় দিত। ২০০৯ সালে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৪ শতাংশে। এ সময়ের মধ্যে রবিবারের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগদানকারীর সংখ্যা ২৭ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪.৫ শতাংশে।

প্যারিসের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহর ক্রেটেইলে ধর্মান্তরিতদের জন্য একটি আধুনিক ও সুপ্রশস্ত মসজিদ রয়েছে। ৮১ মিটার উঁচু মিনারের এই মসজিদটিতে বছরে ১৫০ বার ইসলাম গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এটা ফ্রান্সে ইসলামের শক্তিশালী অবস্থানের প্রতীক। অন্যদিকে পুরনো গির্জাগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কারণ- সেখানে এখন কেউই যায় না। ফলে এটি পরিত্যক্ত পড়ে থাকে। জর্জ ওয়েগেল 'দা কিউব অ্যান্ড দা ক্যাথেড্রাল' নামে একটি বই লিখেছিলেন। তাতে তিনি জমকালো আধুনিক সেক্যুলার ফ্রান্সের প্রতীক হিসেবে প্যারিসে প্রেসিডেন্ট ফ্রাসোয়াঁ মিতেরাঁ নির্মিত 'গ্রান্ড আর্চ ডি লা বিল্ট'কে দেখিয়েছেন 'কিউব' হিসেবে। আর ক্যাথেড্রাল হলো ক্যাথেড্রাল অব নটরডেম। এটি এখন পর্যটকদের জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। ফ্রান্সে ক্যাথেড্রালের ওপর জয়ী হয়েছে কিউব। তবে কিউব আর ক্যাথেড্রালের উভয়ের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে ক্রমবর্ধমান ইসলামিক অর্ধচন্দ্র।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্র সংবাদ

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৪

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ এপ্রিল, শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'কর্মী সম্মেলন ২০১৪' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি তার ভাষণে বলেন, 'আদর্শ যুবশক্তিই সমাজ পরিবর্তনের মূল নিয়ামক। তারা দেশ ও জাতির মেরুদ-। অথচ সেই যুব শক্তিকে দেশের শত্রুরা জঙ্গী তৎপরতার নামে ভুল পথে পরিচালিত করছে। ইসলামের অপব্যাখ্যা করে তারা মানুষকে কাফের ফৎওয়া দিচ্ছে। এভাবে তারা ইসলামকেই বিতর্কিত করছে। অতএব এ ব্যাপারে জনগণকে সাবধান হতে হবে। তাই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তরুণ সমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে'। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ কস্মিনকালেও বিভক্ত হয়নি। বিভক্ত হবেও না কোনদিন। চিরকাল একটায় থাকবে। যারা সত্যিকার আহলেহাদীছ তারা চিরদিন একটা। রাফাইয়াদায়নরা বিভক্ত হয় আহলেহাদীছ কখনো বিভক্ত হয় না'। তিনি আরো বলেন, 'দুনিয়াবী স্বার্থের সংঘাতে যারা প্রতিমুহূর্তে বিপর্যস্ত ও টালমটাল ঈমান নিয়ে আমাদের সাথে চলাচল করে আমরা তাদেরকে অন্ত র থেকে ঘৃণা করি'। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন চলবে স্থির লক্ষ্যে ও সুনির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে। আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশকে পরিবর্তন করা। শিরক-বিদ'আত অধ্যুষিত এদেশকে পরিবর্তন করাই আমাদের মৌলিক লক্ষ্য। আর আল্লাহ্র কাছে জান্নাত পাওয়া আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এম.পি ও মন্ত্রী হওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করি না। আমরা জান্নাত পাওয়ার জন্য আন্দোলন করি। যদি সরকারের ফাঁসির কাষ্ঠে মৃত্যু হয় তাহলে ঐ ফাঁসিই আমার জন্য রহমত। ফাঁসি আর গুলির তোয়াক্কা আমরা করি না'। তিনি বলেন, 'আমার এই সমাজ আমার মাতৃভূমী। এর প্রতি আমার হক আছে। এই মাতৃভূমিকে অবশ্যই আমি শিরক ও বিদ'আতের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করব ইনশাআল্লাহ'।

তিনি দাওয়াত প্রসঙ্গে বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) দাওয়াত দিয়ে মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করেছেন। আমরাও সেই আক্বীদা পরিবর্তনের আন্দোলন করি। বাংলাদেশে যত দল দাওয়াতী কাজ করছে কারোরই লক্ষ্য জান্নাত নয়; সবারই লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। ইসলামপন্থী হোক চাই ইসলাম বিরোধী হোক'।

নেতাদের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'দুনিয়াবী কিছু পদলোভের জন্য আমরা আন্দোলন করি না। পদলোভী লোকগুলো দিয়ে কস্মিনকালেও হক্ব প্রতিষ্ঠা হয় না। হবেও না কোনদিন। অতএব সাবধান'!

ধনীক শ্রেণীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'হে টাকাওয়ালারা! তোমরা সাবধান হও। তোমরা টাকা দিয়ে আমাদের খরীদ করতে পারবে না। আমরা অবশ্যই অর্থ চাই, ঐ অর্থ যে অর্থ স্রেফ আল্লাহ্র জন্য দান করা হয়। তুমি আমাদেরকে অর্থ দিবে আর আমরা তোমার গোলামী করব; যিন্দেগীতে তা পারবে না। অর্থ দিয়ে অন্যদের খরীদ করা যায় কিন্তু 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কোন কর্মীকে খরীদ করতে পারবে না'।

তিনি 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'বাতিলদেরকে ভয় দেখাতে গেলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একদল মানুষ প্রয়োজন। যাদের লক্ষ্য থাকবে জান্নাত ও নির্ভেজাল তাওহীদ এবং তাদের সাথে থাকবে একজন দৃঢ়চিত্ত আমীর। কেননা আমীর ব্যতীত জামা'আত হয় না। আর জামা'আত ব্যতীত আমীর হয় না। আহলেহাদীছ আন্দোলন ইমারত ও বায়'আত ভিত্তিক সংগঠন। অর্থাৎ আমরা এই মর্মে দৃঢ় প্রতিজ্ঞবদ্ধ হয়েছি যে, এই দেশের যমীনকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ'। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 'স্থির লক্ষ্য নির্ধারণ কর, বিলাসিত ও অলসতা ছাড়। আনুগত্যশীল হও, অবাধ্য হয়ো না। তানাহলে দুনিয়া আখেরাত দু'টিই বরবাদ হয়ে যাবে'।

পরিশেষে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, পাঁচটি গুণ অর্জন করতে পারলে সমাজ পরিবর্তন হবে। (১) নিরঙ্কুশ তাওহীদের বিশ্বাস (২) সুন্নাতের পাবন্দ হওয়া (৩) সর্বদা জিহাদী জাযবা থাকা (৪) আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হওয়া এবং (৫) নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়া। তাই আশাকরি বাংলার যমীনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ছাড়া আর কোন সংগঠন টেকসহ হবে না ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ! তুমি আমদেরকে কবুল কর-আমীন!! সবশেষে 'কর্মী সম্মেলন ২০১৪' আয়োজক ও উপস্থিত সকল কর্মী ও সুধীদের জন্য তিনি ধন্যবাদ ও প্রাণখোলা দো'আ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাল্লীপ থেকে আগত, বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও 'দাম্মাম ইসলামিক সেন্টার সঊদী আরব'-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের মাননীয় পরিচালক মুহতারাম শায়খ জা'ফর আব্দুল্লাহ ফায়েয (মাল্লীপ)। তিনি তার আরবী ভাষণের প্রারম্ভে এ সম্মেলনে দাওয়াত পাওয়ায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। অতঃপর তিনি বলেন, প্রিয় ভাইসকল! আমি আজ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি বহুদূরের পথ অতিক্রম করে আপনাদের নিকটে সামান্য কিছু কথা তুলে ধরতে পারার কারণে। তিনি উপস্থিত সকলকে অবগতির জন্য তিনটি বিষয়ে আলোচনা করেন। (১) দাওয়াত (২) শিক্ষা ও (৩) পবিত্রতা। দাওয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নবী-রাসূলগণের দাওয়াতের মৌলিক ভিত্তি ছিল তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব প্রতিষ্ঠা। এরজন্য তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন। কিন্তু শত যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তারা দাওয়াতের ময়দান থেকে সামান্যতম পিছপা হননি'। শিক্ষা সম্পর্কে যুবকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'যুবকদেরকে দ্বীনের বিশুদ্ধ জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে। এজন্য তাদেরকে যাবতীয় পাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকতে হবে'। পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আজকে মুসলিমদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার একটা অভাব রয়েছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ' ও 'পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ'। তিনি বলেন, 'আমি একবার হজ্জ সফরে ছিলাম। আমার সাথে রাশিয়ান কিছু হাজী ছাহেবান ছিলেন। অতঃপর তাদেরকে পেপসি কিংবা আরসি

খেয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে দেখলাম। তখন আমি আশ্চর্য হয়ে তাদেরকে বললাম, তোমাদের অন্তর কিরূপ পরিষ্কার হবে; অথচ তোমরা রাস্তাঘাট অপরিষ্কার করছ'! তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধুপমান করে থাকে। অথচ এরা যদি ধুপমান করে তাহলে অন্যদের কি অবস্থা হবে? তারা সেখান থেকে যা শিখছে তার প্রতি আমল করছে না। সুতরাং আমাদের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা কিংবা দ্বীনী প্রতিষ্ঠান থেকে সত্যিকার মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের জন্য সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া'। পরিশেষে তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমরা যেন আজকের দিনের ন্যায় সবাই আল্লাহ্র জান্নাতে একত্রিত হতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন'। উল্লেখ্য মুহতারাম বিদেশী মেহমানের বক্তব্য বাংলা অনুবাদ করেন 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

কেন্দ্রীয় সভাপতি তার ভাষণে বলেন, 'আজকে দু'টি দিক সমাজে উপস্থিত। প্রথমতঃ ধর্মের নামে একটা শ্রেণী সমাজে বসবাস করে, যারা মানুষকে পরিচালনা করে শিরকে আকবারের দিকে। তারা মাযার পূজা, কবর পূজা, গাছ পূজা, পাথর পূজা, খাম্বা পূজা, পীর পূজা, মুরীদ পূজা, বুযুর্গ পূজা ইত্যাদির দিকে নিয়ে গিয়ে মানুষকে মুশরিক বানাচ্ছে। (দুই) ইসলামকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য তৈরী করা হয় জাহেলি মতবাদ। যাকে নব্য জাহেলিয়াত বলা হয়। এই নব্য জাহেলিয়াতের কারণে ইসলাম আজ কোনঠাসা। এর মুকাবেলা করার জন্য 'রাজনীতিই ধর্ম' নামে শী'আদের অনুকরণে বাংলাদেশেও ইসলামী রাজনীতি নতুন করে চালু হয়েছে। এমতাবস্থায় এই দু'টি ধারাকে মুকাবেলা করার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাক্বওয়াশীল ও দূরদর্শী কর্মী। যারা শারঈ জ্ঞানে হবে পাকাপক্ক এবং আধুনিক জ্ঞানে হবে অভিজ্ঞ'। এটিই আজকের 'কর্মী সম্মেলন ২০১৪'-এর উদাত্ত আহক্ষান। পরিশেষে তিনি বরেন, 'বর্তমান এই সমাজের পট পরিবর্তনের জন্য দরকার দূরদর্শী, তাক্বওয়াশীল, দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মী। তবে তিনি সমাজ বিপস্নবের পথে কয়েকটি বাধার কথা উল্লেখ করেছেন। (১) লৌকিকতা (২) অতিভক্তি (৩) আত্মঅহংকার (৪) বিচক্ষণতার অভাব এবং (৫) স্বার্থপরতা'।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মেছবাহুল ইসলাম, কুমিলা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জামীলুর রহমান, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক, জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদ, মদীনা ইসলমী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। উল্লেখ্য, সম্মেলনে আলোচকবৃন্দ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের উপর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নিম্নোক্ত **১১** দফা দাবী বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সচেতন জনগণের নিকটে পেশ করা হয়। দাবীগুলো নিম্নরূপ :

(১) দেশের আইন, শাসন এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) যুবচরিত্র বিধক্ষংসী অশ্লীল বইপত্র, সাহিত্য ও ছবিসমূহ প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে।

(৩) সন্ত্রাস, গুম, হত্যা, হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, নৈরাজ্য ও দুর্নীতির উচ্ছেদ করতে হবে এবং দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিবিদদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে।

(৪) মদ ও মদ জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপনন নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে সন্ত্রাস ও নোংরা রাজনীতি মুক্ত করতে হবে এবং মেধাভিত্তিক ছাত্রসংসদ গঠন ও লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) সহ-শিক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা পৃথক শিফটিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৭) দল ও প্রার্থী বিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৮) যথাযথ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জঙ্গী তৎপরতা দমন করতে হবে, যেন নিরীহ মানুষ ও হক্ব সংগঠনের উপর অত্যাচার করা না হয়।

(৯) স্বাধীন দেশে অনাকাঙ্ক্ষিত বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

(১০) দেশে প্রচলিত সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

(১১) মাদরাসায় ছবি টাঙ্গানো এবং বিভিন্ন দিবস পালন ও রাজনৈতিক কর্মসূচী পালনের আওতামুক্ত রাখতে হবে।

'কর্মী সম্মেলন'-এর আরো সংবাদ :

প্রচ- দাবদাহের মধ্যেও কর্মী, কাউন্সিল ও সুধীম-লীদের উপস্থিতি সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। উক্ত সম্মেলনে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ছাত্র হাফেয আব্দুল বারী। ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান শফীকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল-মারূফ, আব্দুস সালাম (যশোর)। উল্লেখ্য, দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে বাসযোগে কর্মীরা উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

গ্রন্থ প্রকাশ : কর্মী সম্মেলনে 'যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কর্তৃক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন প্রণীত 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন' গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। যার নির্ধারিত মূল্য ১৩০/- টাকা।

তাওহীদের ডাক প্রকাশ : কর্মী সম্মেলন ২০১৪ উপলক্ষ্যে যুবকদের হৃদয় স্পন্দন 'তাওহীদের ডাক' প্রকাশিত হয়।

সুদৃশ্য গ্যালারী নির্মাণ : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্ররা 'কর্মী সম্মেলন ২০১৪' উপলক্ষে পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত চৌবাচ্চার দক্ষিণপ্রান্তে এবং মূল প্যা-েলের পূর্ব দিকে 'কর্মী সম্মেলন ২০১৪ সফল হোক' শিরোনামে একটি সুদৃশ্য গ্যালারী তৈরী করে। যা সম্মেলনে আগত কর্মী ও সুধীম-লীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সম্মেলন শেষে উক্ত গ্যালারী পরিদর্শন করেন।

সুদৃশ্য প্যা-েল : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কর্মী সম্মেলন বরাবরই রাজধানী ঢাকার বুকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবারই প্রথম নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল প্যা-েলের চতুর্দিকে রকমারী রঙ্গিন কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। যার কারণে প্রচ- গরম কিছুটা হালকা হয়। অন্যান্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্যা-েলের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় পানির ব্যবস্থা করা হয়। যা তীব্র গরমে উপস্থিতিদের মধ্যে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়।

যুবসংঘ লাইব্রেরী : কর্মী সম্মেলনের প্যা-েলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'যুবসংঘ লাইব্রেরী' স্থাপন করা হয়। যেখানে যুবসংঘ প্রকাশনী, হাদীছ ফাউ-েশন প্রকাশনী, সোনামণি প্রকাশনী, আছ-ছিরাত প্রকাশনী সহ সংগঠনের যাবতীয় বই ও সিডি বিক্রয় করা হয়। যেখান থেকে আগত সুধীম-লীরা খুব সহজেই বই ক্রয় করে উপকৃত হয়।

উল্লেখ্য যে, পরিশেষে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন উক্ত সম্মেলনের সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এবং উপস্থিতি সকলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানিয়ে মজলিস শেষের দো'আ পাঠের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা (পশ্চিম) ২৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রধান উপদেষ্টা নূরুল ইসলাম প্রধানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ডাঃ আওনুল মা'বুদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, বগুড়া যেলার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রাযযাক, সাবেক সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আল-আমিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা পূর্ব যেলার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মশিউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ইউনুছ আলী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি' পরিচারক হাফেয ওবাইদুল্লাহ, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ।

বিশ্বনাথপুর, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার আদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক ইয়াসীন আলী প্রমুখ। উল্লেখ্য প্রধান অতিথি মহোদয় উক্ত মসজিদে জুম'আত খুৎবা প্রদান করেন।

ইসলামী পাঠাগার উদ্বোধন

বিশ্বনাথপুর, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২ মে শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ কানসাট থানাধীন আবক্ষাস বাজারে অবস্থিত 'যুবসংঘ'-এর কানসাট এলাকা কার্যালয় ও ইসলামী পাঠাগার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এখানে 'হাদীছ ফাউ-েশ বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই সমূহ পাওয়া।

যেলা সংবাদ

মহিমাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৪ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় মহিমাগঞ্জ শাখা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে আলোচন করেন গাইবান্ধা পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ। পরিশেষে রাফিউল ইসলামকে সভাপতি ও আব্দুল হামীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা শাখা পূর্ণ গঠন করা হয়।

বুড়াবুড়ি, রহমতপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা পশ্চিম, ১৭ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর বুড়াবুড়ি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উক্ত শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন শাখা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ বিপস্নব। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আশিকুর রহমান।

নাকাইহাটম গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা পশ্চিম ১৮ এপ্রিল, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ নাকাইহাট শাখা 'যুবসংঘ' কর্তৃক আয়োজিত নাকাইহাট ৩নং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন গাইবান্ধা সরকারী কলেজের শিক্ষার্থী আব্দুর রাকীব। প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বুদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন। উক্ত অনুষ্ঠানে আব্দুর রাকীবকে সভাপতি করে নাকাইহাট শাখা গঠন করা হয়।

ধুন্দিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৮ এপ্রিল, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ধুন্দিয়া শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও যেলা সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বুদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

আরামনগর, জয়পুরহাট, ৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর জয়পুরহাট শহর আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জয়পুরহাট সরকারী কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের উদ্যোগে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক ও ইংরেজি বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ নাজমুল হক্বের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য সাংবাদিক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আবু তারেক প্রমুখ। পরিশেষে ৩০ জন সরকারী কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মাদ নাজমুল হক্বকে সভাপতি এবং মাজেদুর রহমানকে সাধরণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট জয়পুরহাট সরকারী ডিগ্রী কলেজ শাখা গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ ১০ বছর পর জয়পুরহাট সরকারী ডিগ্রী কলেজ শাখা গঠন করা হয়। ফালিল্লাহিল হামদ্ ।

চাঁদমারী, পাবনা ১৩ জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' পাবনা যেলার উদ্যোগে এক যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তারেক হাসান এ যেলা, থানা, এলাকা ও শাখার বিভিন্ন দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সভাপতি একই যেলার গোবিন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন এবং একইদিনে বাদ এশা গোবিন্দা আল-আমিন জামে মসজিদে 'ছালাতে'র উপর এক গুরুত্বপূর্ণ দারস প্রদান করেন। উক্ত দারসে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পাবনা সদর উপযেলা চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্জ মোশাররফ হোসেন এবং যেলা 'যুবসংঘ'-এর বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

অবশেষে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' অবৈধ দখলমুক্ত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রকাশনা সংস্থা **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** সুদীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটের সম্মুখবর্তী সুদৃশ্য ৫তলা ভবনটি কুচক্রী মহলের কব্জা থেকে দীর্ঘ আইনী জটিলতা ও প্রক্রিয়ার পর অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। গত ৭ মে রোজ বুধবার রাত ১০ টায় স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর মাননীয় সচিব অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভবনটির দখল বুঝে নেন।

উল্লেখ্য 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর ভবনটি অবৈধভাবে কুচক্রীদের হাতে চলে যাওয়ার পর উক্ত ফাউণ্ডেশনের কাজ চরমভাবে ব্যহত হয়। ফলে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়াতে অস্থায়ীভাবে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন পর ভবনটি অবৈধ দখলমুক্ত হওয়ায় মহান আল্লাহ্র দরবার অশেষ শুকরিয়া আদায় করেন ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'দীর্ঘদিন পর ফাউণ্ডেশন দখলমুক্ত হওয়ায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর কার্যক্রম আরো সুচারুরূপে পরিচালিত ও সম্প্রসারিত হবে ইনশাআল্লাহ'।

ইসলামী সম্মেলন

যশোর, ২৫ এপ্রিল, শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৫ ঘটিকায় যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন নবকিশলয় স্কুল মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সদর উপযেলার উদ্যোগে 'ইসলামী সম্মেলন ২০১৪' যশোর সদর উপযেলার সভাপতি জনাব যিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নুরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফিকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান জনাব শফিকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইবাদুল্লাহ বিন আবক্কাস (সাতক্ষীরা), 'আন্দোলন'-এর কেশবপুর উপযেলার সহ-সভাপতি মুত্তালিব বিন ঈমান (যশোর) প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ'-এর যশোর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি আশরাফুল আলম।

মহিলা সমাবেশ

ঘোনাপাড়া, জয়পুরহাট, ৭ মে, বুধবার : অদ্য দুপুর ২.০০ টা ঘোনাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঘোনাপাড়া 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' শাখার উদ্যোগে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুবকর ছিদ্দীক, শাখা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, কমরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলহাজ্জ আশরাফ হোসেন, আলহাজ্জ বাদেশ আলী আকন্দ, আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আলী, আব্দুল ওয়ারেশ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, উক্ত মহিলা সমাবেশে কয়েক'শ মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

মারকায সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী**, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষে দাখিল পরিক্ষায় মোট ২৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৪ জন জিপিএ ৫ (গোল্ডেন এ+) সহ মোট ২১ জন 'এ+', ৬ জন 'এ' এবং ১ জন (এ-) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সংগঠন কর্তৃক পরিচারিত **মহিলা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা**, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকে প্রথমবারে মত ৯ জন শিক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৫ জন 'এ+', ৩ জন 'এ' এবং ১ জন 'ডি' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া **দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ**, বাঁকাল, সাতক্ষীরায় ২৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এদের মধে ৩ জন জিপিএ ৫ (গোল্ডেন 'এ+') সহ মোট ১৫ জন 'এ+' এবং বাকী ১০ জন 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা সবাই সকলের কাছে দো'আ প্রার্থী।

Contents

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

(মসজিদুল হারাম : পর্ব-৪)

১. গেলাফের মাঝ বরাবর পট্টিতে কী লিপিবদ্ধ করা আছে?
উত্তর : কারুকার্যখচিত পবিত্র কুরআনের আয়াত।
২. কা'বার দরজা বরাবর পর্দা আকারে কী যুক্ত থাকে?
উত্তর : অত্যন্ত সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফীতে আঁটা ঝালর।
৩. 'মুলতাযাম' কাকে বলে?
উত্তর : হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে কা'বা ঘরের দরজা পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানটুকুকে মুলতাযাম বলে।
৪. 'মুলতাযাম'-এর দৈর্ঘ্য কত?
উত্তর : ৪ হাতের (২ মিটার) মত।
৫. 'মুলতাযাম' নামকরণের কারণ কী?
উত্তর : এ স্থানে রাসূল (ছাঃ) কা'বার দেয়ালের সাথে চেহারা, বুক ও হাত মিশিয়ে দিতেন বলে এ স্থানের নাম 'মুলতাযাম' বা 'মিলিত হওয়ার স্থান'।
৬. 'হাতীম' কাকে বলা হয়?
উত্তর : কা'বার উত্তর-পশ্চিমাংশে দেড় মিটার উচ্চতার অর্ধবৃত্তাকার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অংশটিকে 'হাতীম' বলে।
৭. 'হাতীম' কা'বার কোন্ অংশে অবস্থিত?
উত্তর : উত্তর-পশ্চিমাংশে।
৮. হাতীমকে ঘিরে স্থাপিত প্রাচীরটিকে কী বলা হয় ?
উত্তর : হিজরে ইসমাঈল।
৯. কা'বাঘরের প্রাচীর থেকে এই প্রাচীরের মর্ধবর্তী দূরত্ব কত?
উত্তর : ৮ মিটার।
১০. হাতীম অংশটি কিসের অংশবিশেষ?
উত্তর : মূল কা'বার।
১১. কা'বাঘরের প্রাচীর থেকে এটি বাইরে থাকার কারণ কী?
উত্তর : কুরাইশরা অর্থাভাবে এটাকে কা'বার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি।
১২. উক্ত অংশটিকে হাতীম বা ধক্ষংসকৃত বলা হয় কেন?
উত্তর : এখানে তওবা করলে পাপসমূহ ক্ষমা করা হয় অথবা স্থানটি কা'বার ভগ্নাংশ।
১৩. হাদীছের দৃষ্টিতে কা'বার আয়াতন কত?
উত্তর : ৬ হাত বা ৩ মিটার *(মুসলিম হা/৩৩০৮)*।
১৪. 'মীযাব' কী?
উত্তর এটি কা'বাগৃহের ছাদ থেকে পানি পড়ার নালা।
১৫. পূর্বে কা'বাগৃহের আকৃতি কেমন ছিল?
উত্তর : ছাদহীন।
১৬. সর্বপ্রথম কারা কা'বাগৃহের ছাদ নির্মাণ করেন?
উত্তর : কুরাইশরা।
১৭. 'মীযাব' তৈরী করে সর্বপ্রথম কারা?
উত্তর : কুরাইশরা।
১৮. বর্তমানে এই নালাটি কী দ্বারা তৈরী করা হয়েছে?
উত্তর : স্বর্ণের প্রলেপ।
১৯. কা'বাগৃহের চতুর্পাশ্বের খোলা আঙ্গিনাকে কী বলা হয়?
উত্তর : মাত্বাফ।
২০. মাত্বাফ নামকরণের কারণ কী?
উত্তর : এখানে ত্বাওয়াফ করা হয় বলে।
২১. এটি সর্বপ্রথম পাকা করেন কে?
উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)।
২২. তখন কাকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করা হত?
উত্তর : মাক্বামে ইবরাহীমকে।
২৩. কা'বার চতুর্পার্শ্বে কাতার তৈরী করেন কে?
উত্তর : গভর্নর খালিদ আল-ক্বাছরী।
২৪. গভর্নর কত হিজরী শতাব্দীতে কা'বার চতুর্পার্শ্বে কাতার তৈরী করেন?
উত্তর : ২য় শতাব্দী হিজরীতে।
২৫. কী কারণে গভর্নর কাতার বৃদ্ধি করেন?
উত্তর : মুছল্লীসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে।
২৬. কত হিজরীতে কা'বার চারপাশে চারটি মুছল্লা নির্মাণ করা হয়?
উত্তর : ৮০১ হিজরী মোতাবেক ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে।
২৭. কা'বার চারপাশে চারটি মুছল্লা কার নির্দেশে নির্মিত হয়?
উত্তর : মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূকের নির্দেশে।
২৮. চার মুছল্লা স্থাপনের কারণ কী?
উত্তর : চার মাযাহাবের অনুসারীরা পৃথক পৃথক মাযাহাবের ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের জন্য।
২৯. চার মুছল্লার এই জঘণ্য প্রথা কে উচ্ছেদ করেন?
উত্তর : সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয আলে সাঊদ।
৩০. কত হিজরীতে চার মুছল্লা উৎখাত হয়?
উত্তর : ১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে।
৩১. 'মাক্বামে ইবরাহীম' কাকে বলে?
উত্তর : যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আঃ) কা'বাঘর নির্মাণ করেছিলেন তাকে 'মাক্বামে ইবরাহীম' বলে।
৩২. প্রাথমিক অবস্থায় 'মাক্বামে ইবরাহীম' কোথায় রাখা হত?
উত্তর : কা'বাঘরের খুব কাছেই।
৩৩. কা'বাঘরের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেন কে এবং কেন?
উত্তর : ওমর (রাঃ); ত্বাওয়াফের সুবিধার জন্য।
৩৪. 'মাক্বামে ইবরাহীম'-কে প্রাথমিক অবস্থায় কিভাবে সংরক্ষণ করা হত?
উত্তর : সিন্দুকের মধ্যে রেখে।
৩৫. ১৯৬৭ সালে সঊদী সরকার পাথরটিকে কোথায় প্রতিস্থাপন করে?
উত্তর : একটি মূল্যবান ক্রিস্টাল পাথরের উপর।
৩৬. পাথরটি কত মিটার উঁচুতে এবং কী দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়?
উত্তর : ৩ মিটার উঁচুতে লোহার শক্ত জালি দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়।
৩৭. ১৯৯৭ সালে কত টাকা ব্যয়ে 'মাক্বামে ইবরাহীম'-কে পুনসংস্কার করা হয়?
উত্তর : ২০ লক্ষ রিয়াল ব্যয়ে।
৩৮. পাথরটি পূর্বে কেমন পাথরের উপর ছিল?
উত্তর : কালো পাথরের উপর।
৩৯. ১৯৯৭ সালে কোন্ পাথরের উপর রাখা হয়?
উত্তর : সাদা মর্মর পাথরের উপর।
৪০. পাথরটি দেখার সুবিধার জন্য বাইরে কী লাগানো হয়?
উত্তর : স্বচ্ছ গ্রাস।
৪১. পাথরটির চতুর্দিকে কী দ্বারা ঘিরা রয়েছে?
উত্তর : লোহার জালি দিয়ে।
৪২. উক্ত লোহার জালিতে কিসের পালিশ করা আছে?
উত্তর : স্বর্ণের পালিশ।
৪৩. উক্ত পাথরে কার পদচিহ্ন রয়েছে?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)-এর।
৪৪. পদচিহ্নের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কি?
উত্তর : না; বরং সুস্পষ্টভাবে অংকিত রয়েছে।

আইকিউ

[কুইজ-১; কুইজ-২; বর্ণের খেলা-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ২০ জুলাইয়ের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৭ (১) :

১. 'হুজ্জাতুল ইসলাম' কাকে বলা হয়?
২. মাযহাব কত হিজরীতে সূচনা হয়?
৩. এক মুদ সমান কত গ্রাম?
৪. ইসলামের প্রথম শিক্ষকের নাম কি?
৫. 'রিসালাতে দাওয়াহ' গ্রন্থের লেখক কে?
৬. আক্বাবার প্রথম শপথে কয়জন ছাহাবী অংশগ্রহণ করেন?
৭. 'চার মাযহাব মানা ফরয' এটা কি?
৮. অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের নীতিমালা কি?
৯. 'শবেবরাত' কত হিজরীতে কোথায় উৎপত্তি হয়?
১০. পাকিস্তানে ১০ রামাযান কি দিবস পালিত হয়?
১১. বুদ্ধি বৃদ্ধির উপায় কি?
১২. আবু হানিফার মৃত্যুর কত বছর পর মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে?
১৩. '7-Marder'-কি?
১৪. শাহ অলিউল্লাহ যখন ভূমিষ্ট হন তখন দিল্লির রাজা কে ছিলেন?
১৫. 'আল-ফারূক' শব্দের অর্থ কি?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. চারভাগে ২. শাহ অলিউল্লাহ ৩. ১১৪৩ ৪. কুরআনের তাফসীর ৫. মুঘল সাম্রাজ্যের অধিপতি ৬. সম্রাট আকবর ৭. ৬টি ৮. ৫টি ৯. নবীগণের ১০. মাওসেতুং-লেলিন ১১. ১৯৪৪ সালের ঢাকার কাকরাইল মসজিদে ১২. ১৬০ একর ১৩. ২৭২ টি ১৪. একটি টিভি চ্যানেল ১৫. হিন্দুদের মৃত্যুপরবর্তী পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী) ২. মামুন (কুষ্টিয়া) ৩. কেয়া (কুষ্টিয়া)।

কুইজ ১/৭ (২) :

১. কত হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হয়?
২. ঈসা (আঃ)-এর উম্মতের উপর কতদিন ছিয়াম ফরয ছিল?
৩. দাউদ (আঃ)-এর ছিয়ামের পদ্ধতি কেমন ছিল?
৪. রামাযান আরবী মাসের কততম মাস?
৫. রামাযানের মৌলিক উদ্দেশ্য কি?
৬. রামাযান শব্দের অর্থ কি?
৭. বিশ্ব সংবিধান পবিত্র কুরআন কোন্ মাসে নাযিল হয়?
৮. ইসলামের প্রথম যুগে কোন্ ছিয়াম ফরয ছিল?
৯. রাতের ছালাতকে প্রথম অংশে পড়লে কি বলা হয়?
১০. বিশুদ্ধভাবে তারাবীহর ছালাত কত রাক'আত?
১১. 'লায়লাতুল ক্বদর' কখন হয়?
১২. ফিৎরার পরিমাণ কত ও কি দ্বারা দিতে হয়?
১৩. কে অর্ধ ছা ফিৎরার প্রচলন করেন?
১৪. থুথু গিলে ফেললে কিংবা ভুলক্রমে পানাহার করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?
১৫. রামাযান মাসে নেকী কত বৃদ্ধি হয়?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. (১১১৪-১১৭৬ হিঃ/১৭০৩-১৭৬২ খ্রিঃ) ২. মাদরাসা রহীমিয়ার ৩. উনবিংশ শতাব্দিতে ৪. মুহাম্মাদী ৫. দু'টি, যথা : আহলুস সুন্নাহ ও আহলুল বিদ'আ ৬. খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয ৭. বিদ'আতীদের ক্রমান্বয়ে উত্থানের ফলে ৮. ওমর ইবনু আব্দুল আযীয ৯. (৭৭৩-৮৫২) ১০. আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী ১১. আহলুস সুন্নাহ বা আহলুল হাদীছ ১২. বিনাশর্তে ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়া ১৩. কুরআন, হাদীছ ও আছারে ছাহাবায়ের উপর ভিত্তিশীল ১৪. আনছারুস সুন্নাহ ১৫. সালাফী ১৬. জামা'আতে মুহাম্মাদিয়াহ ১৭. মুহাম্মাদী ও আহলেহাদীছ ১৮. আহলেহাদীছগণের ১৯. দু'টি ২০. উপমহাদেশের দুটি দলের নাম।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. মুহাম্মাদ ফায়সাল আহমাদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী) ২. মুজাহিদ (নওদাপাড়া, রাজশাহী) ৩. শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা)।

বর্ণের খেলা ৩/৭ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে নবী-রাসূলদের মৌলিক কাজের নাম জানা যাবে।

১.........................
২.........................
৩.........................
৪.........................

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম.....................

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : ১. তাহমীদ ২. বরকত ৩. তাক্বলীদ ৪. রগবাহ; **অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : তাবলীগ**

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. আল-আমীন (নওদাপাড়া, রাজশাহী)। ২. আবুল কালাম আযায (কোমরগ্রাম, জয়পুরহাট) ৩. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৭:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

+	−	×	÷

							= ৪
১১		২		৩		১	
							= ১০
৮		২		৩		৯	
							=৬
২		৫		৭		৩	

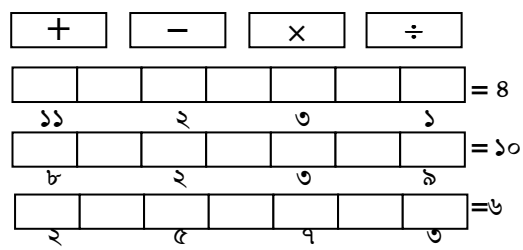

গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর : (১) ১২−৪÷২+৩= ৭ (২) ৫×২+৩−৮ ৫ (৩) ৮÷৪×৩+২=৮

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. নাফিয (নওদাপাড়া, রাজশাহী) ২. আমীনুল ইসলাম (সি.ও কলোনী, সদর রোড, জয়পুরহাট) ৩. জান্নাতুল মুনীর আখতার (গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা :** বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*